সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার

অপূর্বমণি দত্ত

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—তিন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্যামল সেন

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে—

অপূর্ব

দত্তপুলিয়া (নদীয়া),
৭. ৭. ১৯৫৮

একটা চাপা আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই এবং সেই ধূমের অন্তরালে যে বহ্নি চাপা রয়েছে সে এক দিন প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করবে, এটা অনেক বিশারদরা কল্পনা করেছিলেন।

এই আগুনের উত্তাপটা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল দেশবাসীর অন্তরে, যখন তারা দেখলে, ইংরাজের কুটিল রাজনীতির চালে এ দেশের যাঁরা ছিলেন প্রভাবশালী নরপতি, তাঁদের পাকা বুনিয়াদ এক এক করে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে লাগল।

১৮৪৩ সালের প্রথম বলি হল সিন্ধুদেশ। ওখানকার মীরেরা নাকি ছিলেন বড়ই অত্যাচারী। সেই অত্যাচার থেকে সিন্ধুদেশবাসীদের রক্ষা করবার জন্যই সারা দেশটা চলে এল ইংরাজ-সিংহের থাবার তলায়। কয়েক বছর পরেই ১৮৪৯ সালে পতন হল শিবাজীর শেষ বংশধরের এবং সেই সঙ্গে লাল রংয়ে চিহ্নিত হল সাতারা। কেবল শিবাজীর শেষ প্রদীপ নিবল তা নয়, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং—একদিন যিনি 'সব লাল হো যায়েগা' বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁরই পুত্র দিলীপ সিং দেখলেন সত্য-সত্যই তাঁর পিতার রাজ্য লাল হয়ে গেল। ইংরেজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হল সারা পাঞ্জাব। মোটা পেনসন নিয়ে

বাসা বাঁধলেন কেশরীনন্দন দিলীপ সিং ইংলণ্ডের নরফোকে।

যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। ১৮৫২ সালে গেল বর্মা, তার পরের বছরেই একে একে ইংরাজের কুক্ষিগত হল বেরার, নাগপুর, তাঞ্জোর। বৃদ্ধ পেশোয়া বাজীরাও পেনসন নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন কানপুরের কাছে বিঠুরে। তাঁরই পালিতপুত্র ধুন্ধুপন্থ নানা বা ইতিহাসখ্যাত নানা সাহেব।

ইংরাজের লাল রংয়ের তুলি সেখানেই থামল না। ১৮৫৪ সালে লাল হয়ে গেল অযোধ্যা। পেনসন দিতে ইংরাজ বাহাদুর কখনও কার্পণ্য করেন নি। ওয়াজিদ আলি শাহ বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা পেনসন নিয়ে অযোধ্যার রাজতক্ত ছেড়ে এলেন কলিকাতার মেটেবুরুজে। তাঁর নবাবীর গল্প আজও শোনা যায়। স্বয়ং রামচন্দ্রকেও একদিন অযোধ্যার সিংহাসন ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে কুঁড়ে বাঁধতে হয়েছিল সপরিবারে—কিন্তু পেনসন তিনি পান নি।

অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল একদিন অতি তুচ্ছ কারণে। দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের একজন নীচজাতীয় সিপাহীর সঙ্গে আর এক সিপাহীর কি নিয়ে একটা ঝগড়া হল একদিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ। তার জাত্যাভিমান সে ভোলে নি, কাজেই নীচজাতীয় ব্যক্তিটির স্পর্ধার উল্লেখে সে জাতির দোহাই দিলে। সে লোকটিও ছাড়বার পাত্র নয়, সে বললে, জাতের অহঙ্কার আর কোর না ঠাকুর। নূতন যে

টোটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে রাইফেলে পরাচ্ছ, তাতে গরু আর শূয়োরের চর্বি মাখানো। গরুর চর্বি যে দাঁত দিয়ে কাটে, সে আবার জাতের —

জ্বলে উঠল আগুন। এত বড় কথাটার সত্যাসত্য প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হল অনেকে। এনফিল্ড রাইফেল তখন সৈন্যদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তাতে কার্টিজ পরাতে গেলে চর্বিজাতীয় স্নেহপদার্থে সিক্ত করতে হয় এবং কার্টিজের শেষাংশ একটু ছিঁড়ে দেওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং সে কার্যটা দাঁত দিয়ে করাই সুবিধা।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, ও কার্টিজ তাঁদের আবিষ্কার নয়, খোদ Ordnance Committee of Great Britain—তাঁদের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং এখানকার মিলিটারী কর্ম-কর্তারা কেউ তার এদিক-ওদিক করতে পারেন না।

কিন্তু চর্বির ব্যাপারটা ? সেটা কি সত্য ?

পরিষ্কার জবাব দিতে ইতস্তত করতে হল কর্তৃপক্ষের। তাঁরা জানালেন যে, সিপাহীরা যদি ইচ্ছা করে, তবে কোরা কার্টিজে তারা ঘি বা মাখন মাখিয়ে নিতে পারে।

এতদিন গরু-শূয়োরের চর্বি-মাখানো কার্টিজ দাঁত দিয়ে কেটে যে মহাপাপ করা হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত এই স্তোকবাক্যে হয় না।

ছড়িয়ে পড়ল এই খবর এক রেজিমেণ্ট থেকে আর এক রেজিমেণ্টে। দমদম থেকে বারাকপুরে, বারাকপুর থেকে

বহরমপুর। ক্রমে সারা ভারতবর্ষময়।

এ সংবাদ যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে দেশব্যাপী হয়ে পড়ল, এ নিয়ে তখনকার কর্তৃপক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

শোনা যায়, চাপাটি (রুটি) মাধ্যমে নাকি খবর প্রচারিত হত। এক জন চারখানা চাপাটি তৈরি করে চার জনকে দিত, তাদের প্রত্যেকে আবার চারখানা করে চাপাটি চালান করত অন্যত্র। এরই মধ্যে থাকত নাকি সাঙ্কেতিক লিপি এবং এই লিপি chain letter-এর মত ভারতবর্ষময় প্রচারিত হত।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭—বারাকপুর থেকে ৩৪ নং পদাতিক বাহিনী রওনা হয়ে গেল বহরমপুরে। সেখানে থাকত ১৯ নম্বর বাহিনী। কার্টিজের কাহিনী প্রচারিত হল। ১৯ নম্বরের সিপাহীরা পরিষ্কার বললে, ও কার্টিজ আমরা ছোঁব না।

মিলিটারী ডিসিপ্লিনের এই অমর্যাদা দেখে ১৯ নম্বরের সকলের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মনে মনে একটু আতঙ্কিত হলেন।

লর্ড ক্যানিং তখন গভর্নর জেনারেল। তিনি হুকুম দিলেন চুরাশী নম্বর রেজিমেণ্ট যাচ্ছে বর্মায়, তাদের মনে এখনও এই বিষ ঢোকে নি, ফিরিয়ে আন তাদের।

কিন্তু চাপাটি-দৌত্যের কৃপায় কার্টিজ-সংবাদ ইতিমধ্যেই সারা উত্তর-ভারতময় সিপাহীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ দেখলে, সারা ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার, কিন্তু দেশী পল্টনের সংখ্যা তিন

লক্ষ এগারো হাজার। ইতিপূর্বে স্যার চার্লস নেপিয়ার গভর্নমেণ্টকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সংখ্যার এই অসামঞ্জস্যতা দূর করবার জন্য। কিন্তু তখন কিছু করা হয় নি।

কার্টিজ নিয়ে যখন এত হৈ-চৈ তখন দিল্লীর কেল্লায় বসে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ রচনা করলেন এক কবিতা। তাঁর কবিখ্যাতি ছিল—

"কুছ চিল-ই-রূম নাহি কিয়া ইয়া শা-হি-রূষ নেহিন
যো কুছ কিয়া না সারে সে, সো কারতুস নে—

এর মানে হল যে, স্বয়ং রূমের (তুর্কীর) সুলতান বা রূষের সাহ যে জয় করতে পানেন নি, এতদিন পরে কি চর্বি-মাখা কারতুজ দিয়ে তাই হবে?

২৯শে মার্চ তারিখে বারাকপুরের কেল্লায় মঙ্গল পাণ্ডে এক বন্দুক উঁচু করে প্রকাশ্যভাবেই চীৎকার করে উঠল, জাগ ভাই সব, মার ইংরেজকে!

৩৪ নম্বর বাহিনীর এডজুটেণ্ট ছিলেন লেফটনাণ্ট বঘ (Bough)। তিনি এই চীৎকারে গরম হয়ে উঠলেন। ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন মঙ্গল পাণ্ডের দিকে। পাণ্ডে তখন মরিয়া। সে বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়লে বঘ সাহেবের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে। কোমর থেকে পিস্তল বার করে বঘ এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু হঠাৎ ঝলক মেরে উঠল মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ার এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন লেফটনাণ্ট বঘ। বিদ্রোহযজ্ঞে বোধ হয় বঘ সাহেবই প্রথম বলি।

হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছুটে এলেন সার্জেণ্ট মেজর হুডসন, কিন্তু তাঁকেও ধরাশায়ী হতে হল আর একটা তলোয়ারের আঘাতে। তখন জেনারেল হিয়ারসি এসে মঙ্গল পাণ্ডেকে পাকড়াও করলেন।

এর ফল যা হবার তা হল। মঙ্গল পাণ্ডে এবং জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি হল ২১শে এপ্রিল তারিখে।

আগুন নিবল না, জ্বলতে জ্বলতে ছড়িয়ে পড়ল দেশময়।

৯ই এবং ১০ই মে তাণ্ডব সুরু হল দূর উত্তর-পশ্চিমের মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে।

সেদিন রবিবার—ইংরাজ অফিসাররা গির্জায় গিয়ে ধর্মাচরণ করছিলেন, হঠাৎ গুলির আওয়াজে সবাই চমকে গেলেন। বাজারে আগুন জ্বলছে, শহরে চলেছে লুটপাট এবং ক্যাণ্টনমেণ্টে চলেছে হত্যাকাণ্ড।

সেখান থেকে একটা বিরাট দল এল দিল্লী। সম্রাট বাহাদুর শাহ—তখন নামেই সম্রাট—ইংরাজী ভাষায় Titular King মাত্র। অতীতকালে বাহাদুর শাহের পিতামহ সম্রাট শাহ আলম যখন মারহাট্টা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ইংরাজ সৈন্যরাই তাঁকে সে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। লর্ড লেকের নাম এ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা সগৌরবে ঘোষণা করেন। ইংরাজের সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতেই সম্রাট শাহ আলমের জন্য একটা পেনসন নির্ধারিত হয়, এবং ভারতের ভাগ্যবিধাতার স্থান অধিকার করেন ইংরাজ। সেই অবধি দিল্লীর

সম্রাটের মর্যাদা তাঁদের কাছে হয়, "A British subject, pensioner and titular King of Delhi."

এই স্বাধীনতার ইতিহাস—যাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা 'সিপাহী-বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন, তার বিবরণ বহু গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোগল বাহাদুর এবং অন্যান্য পুত্রেরা এই স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন—সেটা ঐতিহাসিক সত্য।

আগুন জ্বলে উঠেছে কানপুরে, বেরিলিতে, লখনউতে। মধ্য-ভারতে, ঝান্সিতে, বিহারে, আরায় এবং আরও বহু জায়গায়।

৮ই জুন দিল্লী অবরোধ সুরু হল ইংরাজ-বাহিনীর দ্বারা, কিন্তু জুন গেল, জুলাই-আগস্টও শেষ হয়ে গেল, তারা দিল্লীর অনতিদূরে পাহাড় [তাকে এখানে বলা হয় রিজ (Ridge)—আসলে এটা আরাবল্লী পর্বতমালার একটা বিক্ষিপ্ত অংশ] থেকে নেমে শহরের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলে না। অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর প্রাকার-বেষ্টনীর কাশ্মীর গেট বিধ্বস্ত করে শহরের মধ্যে প্রবেশ করল ইংরাজ ফৌজ।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ আশ্রয় নিলেন তিন মাইল দূরে তাঁরই পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে। সে বিরাট স্মৃতিসৌধকে একটা কেল্লা বললেও ভুল করা হয় না। নগর জয় করে ছুটলেন ক্যাপ্টেন হডসন বাহাদুর শাহের খোঁজে। বৃদ্ধ সম্রাটকে প্রাণে মারা হবে না এই আশ্বাস দিয়ে মহানুভবতা দেখালেন হডসন, কিন্তু সম্রাটের পুত্রদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যবস্থা হল অন্যরকম।

তাঁদের বন্দী করে নিয়ে আসবার সময় জনতা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কাজেই হডসন সে অবস্থায় আর কি করেন? ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখে গিয়েছেন, "Hodson considered it necessary to shoot down the princes (who had surrendered unconditionally) with his own hand."

বন্দী বাহাদুর শাহের বিচারের আয়োজন হল। পাঁচজন বিচারপতি নিযুক্ত হলেন তাঁর অপরাধের ন্যায়বিচারের জন্য। তা ছাড়া রইলেন গভর্নমেণ্ট প্রসিকিউটার।

সেই বিচারের বিস্তৃত বিবরণ পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট একখানি পুস্তকের আকারে মুদ্রিত করেছিলেন। অসংখ্য চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ সেই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল, বহু সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

আমরা এখানে যেগুলির আলোচনা করব সেগুলি প্রধানতঃ—(১) সম্রাট নামধারী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভি-যোগ (২) চুনীলাল নামা এক ব্যক্তির লেখা সে সময়ের ঘটনা-বলীর একটা দিনপঞ্জী—তারই কিয়দংশ (৩) সম্রাটের বর্ণনাপত্র বা বিবৃতি (৪) গভর্নমেণ্ট প্রসিকিউটারের বক্তৃতা এবং (৫) বিচারের রায়।

॥ বিচার পর্ব ॥

১৮৫৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে স্থরু হল দিল্লীতে এক মিলিটারী কমিশনের বিচারগৃহে দিল্লীর সম্রাট উপাধিধারী বাহাদুর শাহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজদ্রোহের অপরাধে বিচার। পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স এবং দিল্লীর মিলিটারী ডিভিসনের কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল পেনীর আদেশে গঠিত হল এই বিচারসভা।

এই সভার সর্বাধিনায়ক হলেন লেফটনেণ্ট কর্নেল ডয়েস এবং সদস্য নির্বাচিত হলেন—

১। মেজর পামার

২। মেজর রেডমণ্ড

৩। মেজর সইয়ার্স

৪। ক্যাপ্টেন রথনি

এ ছাড়া দোভাষীরূপে রইলেন জেমস মারফি এবং গভর্নমেণ্ট প্রসিকিউটাররূপে মেজর এফ জে হ্যারিয়ট, ডেপুটি-জজ এড-ভোকেট জেনারেল।

॥ অভিযোগ ॥

সম্রাট উপাধিধারী বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল মাত্র চারটি।

প্রথম—বন্দী বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বৃত্তিভোগী হওয়া সত্ত্বেও

১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং নাম-না-জানা বহু সৈন্য এবং সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদের উৎসাহ এবং উপযুক্ত সাহায্য দিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

দ্বিতীয়—১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বন্দী তাঁর পুত্র মির্জা মোগল—তিনিও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের একজন প্রজা—এবং দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অসংখ্য জনমণ্ডলী—তারাও সকলেই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রজা—তাদের সকলকেই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং যথোপযুক্ত সাহায্যও করেছিলেন।

তৃতীয়—বন্দী স্বয়ং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অনুগত প্রজা হয়েও রাজ-আনুগত্য বর্জন করে বিশ্বাসঘাতকরূপে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং সেই দিনই অন্যায়ভাবে দিল্লী শহর অধিকার করেন। এ ছাড়া ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের পুত্র মির্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ করবার জন্য অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

চতুর্থ—বন্দী ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে এবং ঐ সময়ে দিল্লী

প্রাসাদের সীমানার মধ্যে ৮৯ জন খাস ইউরোপীয় এবং মিশ্রিত ইউরোপীয় নর-নারীর নির্মম হত্যাসাধনের সহায়তা করেন এবং ১০ই মে ও ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিয়োজিত সৈন্যদের দ্বারা ইউরোপীয় অফিসার এবং অন্যান্য ইংরাজ নর-নারীর হত্যাসাধনের সহায়তা করেন। হত্যাকারীদের ভাল চাকুরি, পদোন্নতি এবং মর্যাদাবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব দেশীয় রাজন্যবর্গ আছেন, তাঁদের কাছেও হুকুমনামা পাঠান, যাতে তাঁরাও নিজেদের রাজ্যের এলাকার মধ্যে ইংরাজ এবং খ্রীশ্চান নর-নারীদের নির্বিচারে হত্যা করেন। বন্দীর এই আচরণ ভারতবর্ষের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৮৫৭ সালের ১৬ আইন অনুসারে অতি ঘৃণিত অপরাধ বলেই গণ্য হয়।

বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষী বলে ঘোষণা করেন।

সরকার পক্ষ থেকে বাহাদুর শাহের লেখা অথবা স্বাক্ষরিত বহু চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করা হয় প্রমাণস্বরূপে।

চুনীলাল নামা এক ব্যক্তির কাজ ছিল সংবাদ সরবরাহ করা। তার বাড়ি খানাতল্লাশ করার ফলে ১১ই মে থেকে সুরু করে ২০শে মে পর্যন্ত—এই কয়দিনের ঘটনাবলী একটা ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। বিচারসভায় সেই দিনলিপিও উপস্থাপিত করা হল।

১০ই মে, ১৮৫৭—মিঃ ফ্রেজার সাহেব রাত্রে মীরাট হইতে একখানি চিঠি পাইয়া সেখানকার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সংক্রান্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। ১১ই তারিখের সকালে খবর আসিল যে, মীরাটের তৃতীয় ক্যাভালরি এবং দুই দল দেশীয় পদাতিক বাহিনী কার্টিজ ব্যবহারে আপত্তি জানাইয়া এক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহারা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া ফ্রেজার সাহেব ঝঝ্‌ঝরের নবাবের কর্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। Sir Theophilus Metcalfe সেই সময়ে শহরের মধ্যে আসিয়া প্রধান কোতোয়ালকে আদেশ দিলেন যে, দিল্লী শহরের প্রাচীরের সমস্ত ফটকগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং সেখানে প্রহরীর ব্যবস্থা করা হউক। ফ্রেজার সাহেবও সেই সময় তাঁহার বগীতে চড়িয়া শহরের মধ্যে আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দেহরক্ষীরূপে চলিল ঝঝ্‌ঝরের অশ্বারোহী বাহিনী। এই সময়ে শোনা গেল যে, কয়েকজন বিদ্রোহী নদীতীরে আসিয়া সেখানকার টোল-কালেকটরকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। এই বিদ্রোহী দল দিল্লী প্রাসাদের বুরুজের সামনে আসিয়া সম্রাটকে উদ্দেশ করিয়া বলিল যে, তাহারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সুতরাং ফটক খুলিয়া তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক। সম্রাট

তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অধ্যক্ষকে জানান যে মীরাট হইতে একদল সৈন্য আসিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া Captain Douglas সম্রাটের নিকট আসেন এবং ঐসব সেনাদলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, অনর্থক গোলযোগ সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাঁহার এই উপদেশ-বাণীতে তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া কাপ্তেন ডগলাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, তাঁহার সঙ্গে তাহারা ভবিষ্যতে বোঝাপড়া করিবে।

ইতিমধ্যে ফ্রেজার সাহেব কাশ্মীর গেটে আসিয়া সেখানকার প্রহরীদের বলিলেন যে, তাহারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিমক খাইয়াছে, সুতরাং মীরাট হইতে আগত বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে তাহারা যেন তাঁহাকে সাহায্য করে। কিন্তু প্রহরীরা তাহাতে ঠিক সম্মতি দেয় নাই। ফ্রেজার সাহেব তখন ক্যালকাটা গেটে আসিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। তাঁহার জমাদার জোয়াখা সিং তাঁহাকে বলে যে, মুসলমানেরা সকলেই মনে মনে বিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু ফ্রেজার তাহাতে সম্মত হন না।

দেখিতে দেখিতে দিল্লীর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল। Reverend Mr.Jennings এবং আর এক জন প্রাসাদরক্ষীর ঘরের শীর্ষদেশ হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন বিদ্রোহী সৈন্যদের মীরাট হইতে দলে দলে আগমন। Captain Douglas এই সময়ে ফ্রেজার সাহেবের কাছে আসিয়া একখানি চিঠি দিলেন। চিঠি

পড়িয়াই ফ্রেজার তাঁহার দেহরক্ষীদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল, সানবি বাজারের মুসলমানেরা রাজঘাটে যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে এবং ফটক খুলিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা জনস্রোতের মত দরিয়াগঞ্জ মহল্লায় প্রবেশ করিয়া ঘর-বাড়িতে আগুন লাগাইয়া ইউরোপীয়-দের নির্মমভাবে হত্যা করিতে শুরু করিল। দরিয়াগঞ্জের ডাক্তার চমনলাল তাঁহার ডিসপেন্সারীর রোয়াকে দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তিনিও নিহত হইলেন। মুসলমানেরা তখন বিদ্রোহী-দের জানাইল যে, ফ্রেজার সাহেব ক্যালকাটা গেটের নিকটে আছেন। বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ মহা কলরব করিতে করিতে সেই দিকে চলিল এবং প্রহরীদের মধ্যে দুই জন তখনই নিহত হইল। ফ্রেজার সাহেবের দেহরক্ষী কোনও বাধাই দিল না। ফ্রেজার একখানা তরবারির আঘাতে একজনকে আহত করিয়া ডগলাস সাহেবের সঙ্গে বগীতে চড়িয়া কেল্লার ভিতর ফিরিয়া আসিলেন। কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেলেন এবং ফ্রেজার সাহেব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়েই আক্রান্ত হইলেন এবং সেইখানেই নিহত হইলেন।

বিদ্রোহী দল তখন উপরে ছুটিয়া গিয়া নিমেষের মধ্যে কাপ্তেন ডগলাস, রেভারেণ্ড জেনিংস এবং তাঁহার কন্যাকে নির্মম ভাবে হত্যা করিল। এই সময়ে শহরের মুসলমানরা ইউরো-পীয়দের বাড়ি-ঘর লুট করিতে আরম্ভ করিল। Sir Theophilus Metcalfe ঘোড়ায় চড়িয়া উন্মুক্ত তরবারি লইয়া আসিতেছিলেন,

বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। চাঁদনি চকের রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মেটকাফ সাহেব আজমীর গেট দিয়া শহরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দিল্লীর তিনটি পদাতিক সৈন্যদল ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তাহারা কয়েকজনকে হত্যা করিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাশ্মীর গেট, দরিয়া লজ এবং মেজর স্কিনারের বাড়িতে যতগুলি ইউরোপীয় ছিল, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্মমভাবে নিহত হইল। ১২টি থানা ধ্বংস করা হইল এবং রাস্তার সমস্ত আলোগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। তার পর ব্যাঙ্ক আক্রমণ করা হইল। ব্যাঙ্কের দুই জন পুরুষ এবং তিনটি মহিলা দুটি শিশু লইয়া বাড়ির ছাদে উঠিলেন। বিদ্রোহীদের একজন পার্শ্ববর্তী একটা গাছে উঠিয়া ছাদে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলে সে আহত হয়। তখন ব্যাঙ্কের বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই পুরুষ ও মহিলাদের হত্যা করা হইল। স্থানীয় মুসলমানেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া জেহাদ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া ফেলিল। দিল্লীর তিনটি পদাতিক বাহিনী ট্রেজারী লুট করিয়া টাকাকড়ি যাহা পাইল নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। তার পর আদালত এবং কলেজ-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করিল। অশ্বারোহী সৈন্যের দল ক্যান্টনমেণ্ট আক্রমণ করিয়া ওখানকার সমস্ত বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিল।

অতঃপর মীরাট হইতে আগত অশ্বারোহী এবং পদাতিক

বাহিনী সম্রাটের নিকট আসিয়া তাঁহার সাহায্য চাহিল এবং জানাইল যে, সারা ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্রাট তাহাদের জানাইলেন যে, তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু শহরের ধ্বংসলীলা এবং লুটতরাজ বন্ধ করিতে হইবে। সম্রাট তাহাদের সেলিমগড়ে আশ্রয় লইতে বলিলেন।

বিদ্রোহীরা এই সময় সংবাদ পায় যে, বারুদখানায় বহু ইংরাজ নর-নারী আশ্রয় লইয়াছে। তখন তাহারা সেই দিকে অভিযান চালাইল। ইতিমধ্যে শোনা গেল যে, বারুদখানা উড়িয়া গিয়াছে, সেখানকার সকলেই নিহত এবং আশপাশের বহু বাড়িঘর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনজন সার্জেণ্ট এবং দুটি মহিলা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট আনা হইল। সম্রাট তাঁহাদের আশ্রয় দিলেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং তাঁহার পরিজনবর্গ এবং ছদ্মবেশে মিঃ মনরোকে লইয়া বল্লভগড়ে যাত্রা করিলেন। ইতি-মধ্যে কোষাধ্যক্ষ শালিগ্রামের বাড়ি লুণ্ঠিত হইল।

রাত্রে প্রাসাদদুর্গ হইতে ২১ বার তোপধ্বনি দ্বারা সম্রাটকে অভিনন্দিত করা হইল। সারা রাত্রি ধরিয়াই লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ইত্যাদির জন্য সারা দিল্লী শহর আতঙ্কিত হইয়া রহিল।

১২ই মে, ১৮৫৭—মঙ্গলবার সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। ৫৪ রেজিমেণ্টের সুবাদার প্রার্থনা করিলেন যে, প্রতিদিনের রসদ

সরবরাহের জন্য এক জনকে নিযুক্ত করা হোক। অবশেষে রামসহায় মাল এবং দিলওয়ালী মালের উপর আদেশ হইল যে তাহারা প্রতিদিন ৫০০৲ টাকা মূল্যের রসদ সৈন্যবাহিনীকে সরবরাহ করিবে।

সংবাদ পাওয়া গেল, মহম্মদ ইব্রাহিম নামা এক ব্যক্তির বাড়িতে চার জন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া একজন বিদ্রোহী ইব্রাহিমের বাড়ি লুট করিয়া চারিজনকেই হত্যা করিল। একটি ইউরোপীয় মহিলা দেশীয় পোশাকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও অব্যাহতি পাইলেন না।

এই সব সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি পাহাড়-গঞ্জের কোতোয়াল মির্জা মনিরুদ্দীন খাঁকে নগর-অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত করিয়া আদেশ দিলেন যে, অবিলম্বে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। মির্জা সাহেব বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, সেই মুহূর্তেই চৌরী বাজার লুণ্ঠিত হইতেছে। সম্রাট তখন পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ককে আদেশ দিলেন, দুর্গের এবং শহরের সমস্ত ফটকে এক রেজিমেণ্ট করিয়া সৈন্য মোতায়েন করা হউক। প্রজাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়া তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

ইতিমধ্যে নগরশেঠ মহল্লা আক্রান্ত হইল। সেখানকার অধিবাসীরা ইঁটপাটকেল ছুড়িয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জা মোগলকে আদেশ দিলেন যে,

২

লুণ্ঠন ও হত্যা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক। মির্জা মোগল একটি হাতীতে চড়িয়া সৈন্যদল লইয়া বিভিন্ন থানায় উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, লুণ্ঠনকারী দুষ্কৃতদের নাক এবং কান কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং কোনও দোকানদার যদি দোকান বন্ধ করে কিম্বা সৈন্যবাহিনীকে কোনও জিনিস দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করা হইবে এবং জরিমানা করা হইবে।

অতঃপর স্বয়ং বাদশাহ হাতীতে চড়িয়া, দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য এবং কামান লইয়া শহরের প্রধান রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার আদেশ প্রচারিত হইতে লাগিল যে, সমস্ত দোকান খোলা হউক এবং ব্যবসাকার্য যথা-নিয়মিতভাবে চলুক।

প্রাসাদে ফিরিয়া মির্জা মনিরুদ্দিনকে দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সম্রাট তাঁহাকে একটি পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিলেন। মির্জা সাহেব নজরানাস্বরূপ চারি টাকা বাদশাহের নিকট পেশ করিলেন।

১৩ই মে ১৮৫৭, বুধবার—বাদশাহ মসজিদে আসিলেন। নবাব মাহবুব আলি খাঁ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। অভিযোগ হইল যে, সৈন্যরা যথোপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী পাইতেছে না। হাসান আলি খাঁ সম্রাটকে জানাইলেন যে, প্রাসাদে যে সব সৈন্যবাহিনী উপস্থিত রহিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই বিদ্রোহী এবং লুণ্ঠন ও হত্যা

ব্যাপারে তাহারাই বেশীর ভাগ দায়ী। সুতরাং এই সব সৈন্যদের উপর আস্থা স্থাপন করা ঠিক সঙ্গত হইবে না। মির্জা মোগল এবং আরও কয়েকজনকে তখন আদেশ দেওয়া হইল যে, প্রত্যেকে দুটি করিয়া কামান লইয়া কাশ্মীর গেট, লাহোর গেট এবং দিল্লী গেটে যাইয়া শান্তি স্থাপন করুন। মির্জা আবুল বখরকে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, কিষেণগড়ের রাজা কল্যাণ সিংয়ের বাড়ীতে ২৯ জন নর-নারী আত্মগোপন করিয়া আছে, এই সংবাদ পাইয়া সৈন্যদল সেখানে যাইয়া বন্দুকের গুলীতে তাহাদের সকলকেই হত্যা করে। কর্নেল স্কিনারের বাড়িতে কয়েকজন অশ্বারোহী হানা দিয়া জোসেফ স্কিনারের পুত্রকে বন্দী করিয়া আনিয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে হত্যা করে।

মির্জা মনিরুদ্দীন ঘোষণা করিলেন যে, কেহ সৈন্যদলে কাজ করিতে যদি ইচ্ছুক হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে আসিতে পারে; তবে নিজের অস্ত্র সঙ্গে আনিতে হইবে এবং যদি কাহারও বাড়িতে কোনও ইংরাজকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার ফলে প্রায় ২০০ শত ব্যক্তিকে মির্জা সাহেব নিযুক্ত করিয়া শহরের প্রধান রাজপথগুলিতে শান্তিরক্ষার জন্য পাঠাইলেন।

১৪ই মে ১৮৫৭, বৃহস্পতিবার—বাদশাহের কাছে বহু লোক পরিচিত হইলেন এবং সকলেই নজরানা দিলেন।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, চাঁদ রাওলের গুণ্ডার দল প্রতি-রাত্রে সবজিমণ্ডী তেলিওয়ারা অঞ্চলে লুটপাট করিতেছে। সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জা মোগলকে আদেশ করিলেন, অবিলম্বে এই সব লুণ্ঠন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

একজন ইউরোপীয় সৈন্য এবং একজন ইউরোপীয় মহিলা বন্দী অবস্থায় সম্রাটের নিকট আনীত হইল। গুপ্তচর সন্দেহে তাহাদের কারাগারে পাঠানো হইল।

কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্য জুতা পায়ে দিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

চার জন লোক মীরাট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে বৃটিশ বাহিনী দিল্লী অভিমুখে আসিতেছে। এ সংবাদ অবিশ্বাস করিয়া সেই চার ব্যক্তিকে আটক করা হইল।

নিগমবোধ ঘাটের দারোগাকে আদেশ দেওয়া হইল যে, ফ্রেজার ও কাপ্তেন ডগলাসের শবদেহ সমাহিত করা হউক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নর-নারী যাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে তাহাদের দেহ নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। আদেশ প্রতি-পালিত হইল।

১৫ই মে ১৮৫৭, শুক্রবার—মৌলভী আবদুল কাদের সৈন্যদের বাকী বেতনের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করিলেন। মৌলভী সাহেব সম্প্রতি নবাব মাহবুব আলি খাঁর সহকারী নিযুক্ত হওয়ায় সম্রাট তাঁহাকে এক জোড়া শাল উপহার দিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৌলভী

সাহেব প্রস্থান করিলেন।

গোলাম নবী খাঁ, আকবর আলি, মৌলভী আহম্মদ আলি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

খবর পাওয়া গেল যে, গুরগাঁওয়ের ট্রেজারি লুণ্ঠিত হইতেছে। সম্রাট আদেশ দিলেন যে, তৎক্ষণাৎ এক দল সৈন্য লইয়া সেখানকার টাকাকড়ি লইয়া রোহটক ট্রেজারিতে আনা হউক।

আবদুল করিমের প্রতি আদেশ হইল যে, ৪০০ শত পদাতিক এবং এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হউক। পদাতিকের মাসিক বেতন ধার্য হইল প্রত্যেকের ৪৲ টাকা এবং অশ্বারোহীর ২০৲ টাকা।

কাজী ফয়জুল্লা পাঁচ টাকা নজরানা দিয়া সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাকে নগরের কোতোয়াল নিযুক্ত করা হউক। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

দেওয়ানী খাসে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, শাহ নিজামুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি দুই জন ইউরোপীয় মহিলাকে তাঁহার বাড়িতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। শাহ নিজামুদ্দিনকে আনা হইলে তিনি বলিলেন যে, সৈন্যেরা তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসুক এবং সত্যই যদি দেখা যায় যে কোন ইউরোপীয় মহিলা তাঁহার বাড়িতে লুক্কায়িত আছেন, তিনি নিজের মস্তক দিয়াও শাস্তি লইতে প্রস্তুত।

আগা মহম্মদ খাঁর বাড়ি লুণ্ঠিত হইল।

১৬ই মে ১৮৫৭, শনিবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে দরবার

আহ্বান করিলেন। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর কয়েক জন একখানি চিঠি আনিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করিল। চিঠিখানিতে হকিম আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁর স্বাক্ষর এবং মোহরের ছাপ আছে। চিঠিখানি দিল্লী গেটের নিকট একজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে এবং উহা ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিত। চিঠিতে লেখা আছে যে, ইংরাজেরা যদি অবিলম্বে দিল্লী শহর অধিকার করিয়া সম্রাজ্ঞী জিনৎ-মহলের গর্ভজাত পুত্র মির্জা মোগলকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে পত্রলেখকেরা তাঁহাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

চিঠিখানি আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁকে দেখানো হইলে তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে উহা জাল চিঠি। তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত আংটি সম্রাটের সামনে রাখিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, চিঠির সীলমোহরের সঙ্গে এই মোহর মিলাইয়া দেখা হউক। কিন্তু সৈন্যেরা সে কথা বিশ্বাস করিল না। তাহারা নিজেদের তরবারি খুলিয়া আসান-উল্লা এবং মাহবুব আলিকে ঘিরিয়া রহিল এবং জানাইল যে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহাদের যে যোগাযোগ আছে তাহার প্রমাণ তাহারা পাইয়াছে। আরও বলা হইল যে, এই জনাই বোধ হয় ইংরাজ-বন্দীদের ভার লইয়াছেন আসানউল্লা খাঁ; যাহাতে ইংরাজেরা আসিলেই তাহাদের হাতে বন্দীদের সমর্পণ করিয়া তিনি পুরস্কার লাভ করিবেন।

তৎক্ষণাৎ কয়েদখানা হইতে নর-নারী বালক-বালিকা নির্বিশেষে ৫২টি ইউরোপীয় বন্দীদের বাহিরে আনিয়া প্রত্যেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হইল। তারপর সেই সকল মৃতদেহ দুইখানি গাড়িতে বোঝাই করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

লাহোরী গেটের দোকানদাররা অভিযোগ করিল যে, সেখানকার দারোগা কাশীনাথ তাহাদের নিকট এক হাজার টাকা চাহিয়াছে। না দিলে তাহাদের বাঁধিয়া চালান দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছে। কাজী ফয়জউল্লাকে আদেশ দেওয়া হইল, কাশীনাথকে তৎক্ষণাৎ যেন বন্দী করা হয়।

১৭ই মে ১৮৫৭, রবিবার—সৈন্যাধ্যক্ষেরা আসিয়া সম্রাটের কাছে নিবেদন করিল যে, সেলিমগড় দুর্গ তাহারা সুরক্ষিত করিয়াছে। সম্রাট যদি স্বয়ং একবার সেখানে যাইয়া দেখিয়া আসেন তাহা হইলে তাহারা বড়ই আনন্দিত হইবে। সম্রাট তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খোলা তাঞ্জামে সেখানে যাইয়া সব পরিদর্শন করিয়া আসিলেন এবং জানাইলেন যে, দেশের কাজে তাহাদের সাহায্য করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত এবং আসানউল্লা খাঁ, মাহবুব আলি খাঁ এবং বেগম জিনৎমহলের প্রতি তাহারা যেন পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সময় এক ব্যক্তি একখানি চিঠি সমেত ধরা পড়িল। চিঠিখানি মীরাট হইতে ইউরোপীয়দের দ্বারা লিখিত। লোকটিকে একটি কামানের মুখে বাঁধিয়া রাখা হইল।

মির্জা আমিনউদ্দীন খাঁ এবং মির্জা জিয়াউদ্দীন খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং বলা হইল, তাহাদের বহু জায়গীর পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গরহী হারসার হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরগাঁও জেলার রাজস্ব হিসাবে বহু লক্ষ টাকা দিল্লীতে আনীত হইতেছিল, পথে প্রায় ৩০০ শত মেওয়াটি এবং গুজার মিলিয়া সেই টাকার রক্ষীদলকে আক্রমণ করিয়াছে। মৌলভী মহম্মদ বখরকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দেওয়া হইল যে, পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী লইয়া এখনই সেখানে যাইয়া সেই অর্থ উদ্ধার করা হউক।

সম্রাটের দুই জন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, মীরাট হইতে প্রায় এক হাজার ইউরোপীয় সৈন্য কয়েকজন ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাকে লইয়া সূরযকুণ্ডে একটি ছাউনি স্থাপন করিয়াছে এবং হাতী দিয়া কামান আনানো হইয়াছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, গুজাররা মীরাট হইতে সেলিমপুরের রাস্তায় অবাধে লুটতরাজ করিতেছে। সম্রাট দুই দল পদাতিক সৈন্য যমুনাতীরে মোতায়েন থাকিতে আদেশ দিলেন। Sappers & Miners দলের পাঁচটি বিভাগ রুড়কী হইতে মীরাটে আসিয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের কাজ করিতে বলায় তাহারা অসম্মত হয়। ফলে তাহাদের উপর গুলী চালানো হয়। বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে পলাইয়া দিল্লীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং, জয়পুরের রাজা রামসিং, আনোয়ারের রাজা, যোধপুর, কোটা এবং বুন্দীর রাজাদের উপর পরোয়ানা পাঠানো হইল, যেন অবিলম্বে তাঁহারা সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন।

১৮ই মে ১৮৫৭, সোমবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। পাঁচ দল রক্ষীসৈন্য ইংরাজী বাজনা বাজাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল। সম্রাট খেলাৎ এবং উপঢৌকন দিলেন তাঁর অনুগত অনেককে। তাঁর পুত্র মির্জা মোগল সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অন্য পুত্রেরা মির্জা কোটক সুলতান, মির্জা খয়ের সুলতান, মির্জা মেন্দু এবং অন্যান্য সন্তানদের পদাতিকবাহিনীর কর্নেল পদে অভিষিক্ত করা হইল। তাঁহার পৌত্র আবুল বখরকে অশ্বারোহীদের কর্নেলের পদ দেওয়া হইল। মির্জা মোগল সম্রাটকে পাঁচ মোহর নজরানা দিলেন এবং অন্যান্য পুত্রেরা প্রত্যেকে এক মোহর হিসাবে নজরানা দিলেন।

হাসান আলি খাঁকে জানানো হইল যে, তিনি প্রতিদিন দরবারে হাজির থাকিবেন এবং যদি সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলে বিপুল জায়গীর পাইবেন। হাসান আলি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, সৈন্য বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, তবে তিনি স্বয়ং সর্বদা হুজুরে হাজির থাকিবেন।

আলোয়ারে যে দূত পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া জানাইল যে, অসংখ্য গুণ্ডার দল রাস্তা দখল করিয়াছে এবং

অবাধে লুটতরাজ করিতেছে। তাহাদের ঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছে এবং মহারাজাকে যে চিঠি পাঠানো হইয়াছিল, তাহাও কাড়িয়া লইয়া টুকরো টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্নখণ্ডগুলি তাহাদের ফেরৎ দিয়াছে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তবে তাহারা মুক্তি পাইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফারুকনগরের নবাব আহম্মদ আলি খাঁর নিকট পত্র লইয়া যে ব্যক্তি গিয়াছিল সেও ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, গুণ্ডারা তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

Sappers & Miners দল যাহারা মীরাট হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা নিজেদের কাহিনী সম্রাটের নিকট বলিল। তাহাদের সেলিমগড়ে থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

মির্জা আবুল বকর সৈন্য লইয়া গুজারদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু খবর পাওয়া গেল যে, গুজাররা ইতিমধ্যে পলায়ন করিয়াছে।

১৯শে মে ১৮৫৭, মঙ্গলবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিয়া বসিলেন। দুই জন সৈন্য মীরাট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ সৈন্য বেরিলী ও মোরাদাবাদ হইতে মীরাটে সমবেত হইয়াছে। Sappers & Minersদের প্রতি ইংরাজেরা যে আচরণ করিয়াছে তাহারা তাহার প্রতিবাদ জানায়। ইংরাজেরা তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে, তাহারাও প্রত্যুত্তরে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। এই সময় খোদার অভিপ্রায়ে একটি গোলা ইংরাজদের বারুদস্তূপে গিয়া

পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত স্থানটি উড়িয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট খুবই আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দ-জ্ঞাপনের জন্য সেলিমগড় হইতে পাঁচ বার তোপধ্বনি করিবার আদেশ দেওয়া হইল।

সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জা জাওয়ান বখতকে উজিরের পদে নিযুক্ত করিয়া একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং রুপার কলমদান উপহার দিলেন। মির্জা সাহেব দশ মোহর নজরানা দিলেন।

আর এক পুত্র মির্জা বখতাওয়ারকেও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। ইনিও দুইটি মোহর এবং পাঁচটি টাকা সম্রাটকে নজরানা দিলেন।

পাতিয়ালার কুমার অজিত সিং দরবারে উপস্থিত হইয়া এক মোহর নজরানা দিলেন। তাঁহাকেও একটি পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। কুমার সাহেব আরও পাঁচটি টাকা নজরানা দিলেন।

সম্রাট সেলিমগড়ে গেলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে সামরিক অভিবাদন জানাইল। তাহারা বলিল যে, মীরাট হইতে আগত দূত ইংরাজ-শিবির ধ্বংসের যে বিবরণ দিয়াছে তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাহারা নিজেরা মীরাট যাইয়া ইংরাজ-শিবির ভাল করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে। সম্রাট জানাইলেন যে, সেরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহারা করিতে চায়, তাহা যেন সেনাপতি মির্জা মোগলের অনুমতি লইয়া করা হয়।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, দিল্লী শহরের চিকিৎসকমণ্ডলী

জুম্মা মসজিদের চূড়ায় এক নিশান তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী ইংরাজদের নির্মূল করিতে হইবে। বহু মুসলমান সেই পতাকাতলে সমাগত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদের বধ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ পতাকার আর প্রয়োজন নাই। মৌলভী সদয়উদ্দীন খাঁ জুম্মা মসজিদে যাইয়া অনেক বুঝাইয়া ঐ পতাকা সরাইয়া লইতে সমর্থ হন।

২০শে মে ১৮৫৭, বুধবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিলেন। চিকিৎসক মহম্মদ সৈয়দ সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন, জুম্মা মসজিদে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত ইংরাজ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আর সে পতাকার কি প্রয়োজন? চিকিৎসক বলিলেন, অবিশ্বাসী হিন্দুদেরও বধ করা উচিত। সম্রাট বলিলেন, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, সুতরাং হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা পোষণ করা তাঁর ইচ্ছা নয়।

এক ব্যক্তি একটি ছোট্ট পিতলের কামান চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গেল। সম্রাট আদেশ দিলেন, তাহাকে একটি কামানের মুখে বাঁধিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হোক।

মির্জা মোগলকে আদেশ দেওয়া হইল, চারটি কামান, চার দল পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি মীরাট যাত্রা করুন

এবং সেখানকার ইংরাজ-ছাউনি ধ্বংস করুন। মির্জা মোগল জানাইলেন যে, মির্জা আমিনউদ্দিন খাঁ, জিয়াউদ্দিন খাঁ, হাসান আলি খাঁ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের ভূম্যধিকারী, তাঁহাদেরও তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ দেওয়া হউক। কিন্তু এই প্রস্তাবে ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই নীরব রহিলেন। সম্রাট তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া মির্জা আবুল বখরকে আদেশ দিলেন যে তিনি অবিলম্বে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হউন। আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁকে আদেশ দেওয়া হইল, তিনি এই সৈন্যবাহিনীর খাওয়ার খরচ বহন করিবেন।

মবারক খাসে দুই জন ইউরোপীয় লুকাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের হত্যা করা হইল।

কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া জানাইলেন যে, পাঁচ জন বন্দী ইউরোপীয় মহিলা আছেন, তাঁহাদের হত্যা করা হইবে। সম্রাট মাহবুব আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রীলোকদের হত্যা করা নীতিসঙ্গত হইবে কি না। মৌলভী সাহেব অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, মুসলমান ধর্মশাস্ত্র অনুসারে নারীহত্যা করা উচিত নয়।

সম্রাট অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। শোনা গেল, তিনি সম্রাজ্ঞী এবং মুকুন্দলালের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

॥ অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সম্রাট বাহাদুর শাহের বিবৃতি ॥

আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই বিবৃত করা হইতেছে :—

হাঙ্গামা বাধিবার পূর্বদিনেও আমি কিছুই জানিতাম না। সকাল ৮টার সময় বিদ্রোহী সৈন্যদল প্রাসাদের জানালার নিচে আসিয়া একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করে এবং বলে যে, মীরাটের ইংরাজদের বধ করিয়া তাহারা এখানে আসিয়াছে। এই নৃশংসতার কারণ সম্বন্ধে তাহারা বলে যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই জাতিধর্মে আঘাত করিয়া ইংরাজেরা গরু এবং শূকরের চর্বিমাখানো কার্টিজ তাহাদের দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে বাধ্য করায় তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। এই কথা বলিবামাত্র আমি জানালার নিচেকার ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিবার আদেশ দিলাম এবং প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যদলের অধ্যক্ষকে এই গোলযোগের সংবাদ দিলাম। তিনি আমার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে, তিনি নিজে ঐসব সৈন্যদের নিকট যাইয়া তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবেন। সুতরাং ফটক খুলিয়া দেওয়া হউক। আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি বারান্দায় যাইয়া বিদ্রোহী সৈন্যদলকে কিছু বলিলে তাহারা চলিয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ আমাকে জানাইলেন যে, এই সব গোলযোগের প্রতিবিধান তিনি এখনই করিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই ফ্রেজার সাহেব দুইটি বন্দুক চাহিয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ দুইটি পালকি পাঠাইবার প্রার্থনা জানাইয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন। জানা গেল যে, দুইটি মহিলাকে ঐ পালকিতে আমার নিকট পাঠানো হইবে এবং আমি যেন তাঁহাদের বেগম মহলে লুকাইয়া রাখি। বন্দুক এবং পালকি পাঠানোর জন্য আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমি সংবাদ পাইলাম যে, পালকি পৌঁছিবার পূর্বেই ফ্রেজার সাহেব এবং প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যাধ্যক্ষ এবং মহিলাদ্বয় সকলেই ইতিমধ্যে নিহত হইয়াছেন।

আরও কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ দলে দলে দেওয়ানী খাস এবং মসজিদের সম্মুখে আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমি তাহাদের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের উদ্দেশ্য কি ? প্রত্যুত্তরে তাহারা জানাইল যে, তাহারা জীবনপণ করিয়া এতদূরে আসিয়াছে, সুতরাং আমি যেন নীরব দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিয়া কেবল তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া যাই। পাছে তাহারা আমাকেও আক্রমণ করিয়া বধ করে, সেই ভয়ে আমি অন্দর মহলে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এই সব দুষ্কৃতকারীগণ কয়েকজন ইউরোপীয় নর-নারীকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল এবং আমাকে জানাইল যে, বারুদখানা হইতে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের বধ করা হইবে। আমি তাহাদের অনেক

অনুরোধ করিয়া বন্দীদের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম। বিদ্রোহী সৈন্যরা কিন্তু নিজেদের জিম্মায় ঐ বন্দীদের রাখিয়া দিল। পরে আবার তাহাদের হত্যা করিতে উদ্যত হইলে আমি আবার অনুনয়-বিনয় করিয়া ঐ বন্দীদের হত্যা করা হইতে তাহাদের নিবৃত্ত করি। অবশেষে আবার তাহারা তাহাদের ঐ নৃশংস কার্য করিতে উদ্যত হইলে আমি আবার তাহাদের নিরস্ত করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এবারে তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহারা নৃশংসবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ঐ বন্দীদের হত্যা করিল। এই হত্যা-সাধনের জন্য আমি কোন আদেশই দিই নাই। মির্জা মোগল, মির্জা খয়ের সুলতান, মির্জা আবুল বকর এবং আমার ভৃত্য বসন্ত এ সম্বন্ধে আমার নাম লইয়া কোনও আদেশ দিয়াছিল কি না, তাহা আমার জানা নাই।

আমার রক্ষী সৈন্যদলের মধ্যে কেহ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল কি না, তাহাও আমার জানা নাই। যদি কেহ লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয়তো তাহারা মির্জা মোগলের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া থাকিবে। হত্যাকাণ্ডের পরেও আমাকে ও বিষয়ে কেহ সংবাদ দেয় নাই। কয়েকজন সাক্ষী ফ্রেজার সাহেব এবং প্রাসাদের সৈন্যাধ্যক্ষের হত্যা ব্যাপারে আমার ভৃত্যদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধেও আমার একই উত্তর, আমি কোনও আদেশ দিই নাই। তাহারা যদি এ ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকে তবে নিজের ইচ্ছাতেই দিয়া থাকিবে।

আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ফ্রেজার সাহেব বা অন্য কোনও ইউরোপীয়দের হত্যা সম্বন্ধে আমি কোনও আদেশই দিই নাই। মুকুন্দলাল এবং অন্যান্য সঙ্গীরা এ বিষয়ে আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে সবই মিথ্যা। মির্জা মোগল এবং মির্জা খয়ের সুলতান হয়তো এ বিষয়ে আদেশ দিয়া থাকিতে পারেন, কারণ তাঁহারা বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পরে বিদ্রোহী সৈন্যরা মির্জা মোগল, মির্জা খয়ের সুলতান এবং আবুল বকরকে আমার নিকট উপস্থাপিত করিয়া জানাইল যে, উহাদের তাহারা অধিনায়ক করিতে চায়। আমি প্রথমে তাহাদের এ-কথায় কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু সৈন্যেরা যখন পুনঃপুনঃ তাহাদের দাবী জানাইতে লাগিল এবং মির্জা মোগল অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাতার নিকট চলিয়া গেলেন, আমি সৈন্যদের ভয়ে নীরব রহিলাম। আমার নীরব থাকায় তাহারা আমার সম্মতি আছে মনে করিয়া মির্জা মোগলকে তাহাদের সেনাপতি পদে বরণ করিল। হুকুমনামায় আমার স্বাক্ষর এবং সহিমোহর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয়দের হত্যা করিয়া বিদ্রোহী সৈন্যদল আমাকে বন্দী করায় আমার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার কোনও উপায় ছিল না। তাহারা কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট আনিয়া আমাকে স্বাক্ষর এবং সহিমোহর করিতে বাধ্য করে। কয়েক বার তাহারা হুকুমনামার মুসাবিদা করিয়া আমার নিজের

মুন্‌শীকে দিয়া তাহা লেখাইতে বাধ্য করে।

কোন কোন সময়ে সাদা লেফাফাতে তাহারা আমার সীল-মোহরের ছাপ দিয়া লয়। তাহার মধ্যে কি কাগজ ছিল এবং তাহাতে কি লেখা ছিল, তাহা কিছুই আমি জানিতাম না। আমি এবং আমার মুন্‌শী মুকুন্দলাল প্রাণভয়ে কিছুই বলিতে পারিতাম না। আমার নিজ হস্তে লেখা আদেশগুলি সম্বন্ধেও আমার ইহাই বক্তব্য।

মির্জা মোগল বা মির্জা খয়ের সুলতান অথবা আবুল বকর কিংবা তাহাদের সৈন্যরা যখনই কোনও দরখাস্ত আমার নিকটে লইয়া আসিত, তাহাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকিত এবং আমাকে স্বহস্তে সেই সকল দরখাস্তের উপর তাহাদের নির্দেশমত আদেশ লিখিতে বাধ্য করিত। তাহারা আমাকে শুনাইয়া বলিত যে, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য যিনি না করিবেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। তাহাদের ভয়ে আমার কিছুই বলিবার শক্তি ছিল না। তাহারা আমার সম্বন্ধেও অভিযোগ করিত যে, আমি ইংরাজদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছি এবং আসানউল্লা খাঁ, মাহবুব আলি খাঁ এবং সম্রাজ্ঞী জিনৎমহল সম্বন্ধেও তাহারা অনুরূপ ধারণা পোষণ করিত। অবশেষে একদিন তাহারা আসানউল্লার বাড়ি লুট করিয়া তাহাকে বন্দী করিল। তাহাকে হত্যা করিতে তাহারা কৃতসংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু অনেক অনুনয়-বিনয় করায় তাহাকে হত্যা করে নাই, তবে এখনও সে তাহাদের হাতে বন্দী। ইহার পরে

তাহারা এ কথাও বলে যে, আমাকে গদিচ্যুত করিয়া তাহারা মির্জা মোগলকে সিংহাসনে বসাইবে। সুতরাং স্থির ভাবে চিন্তা এবং বিচার করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, এ অবস্থায় আমার পক্ষে কি করা সম্ভব ছিল এবং তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবারই বা কি কারণ আমার থাকিতে পারে। বিদ্রোহীরা আমার কাছে এমন প্রস্তাবও করিয়াছিল যে, রাণী জিনৎ-মহলকে তাহারা ইংরাজের সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করে এবং সেজন্য তাঁহাকেও তাহারা বন্দী করিয়া রাখিবে। আমার যদি কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আসানউল্লা এবং মাহবুব আলি কি কখনও বন্দী হইতে পারিত? না আসানউল্লার বাড়ি লুণ্ঠিত হইতে পারিত?

বিদ্রোহীরা নিজেদের বিচারসভা গঠন করিয়াছিল এবং সেখানে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিত। আমি কোন সময়েই সে সভায় যোগ দিই নাই। আমাকে না জানাইয়াই তাহারা যে কেবল বহু লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে তাহা নয়, সময়ে সময়ে এক একটি রাজপথের সমুদয় বাড়ি অবাধে লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বণিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজন মত টাকা জোর করিয়া আদায় করিয়া লইয়াছে। এ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? তাহারা হঠাৎ আসিয়া আমাকেও বন্দী করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের ইচ্ছামত কার্য না করিলে আমাকেও হত্যা করিবার ভয় দেখাইল। এ কথা সকলেই জানে।

এই অবস্থায় হতাশ হইয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া আমি প্রথমে কুতব সাহেবের দরগায় যাইব, তারপর যাইব আজমীরে এবং সেখান হইতে চলিয়া যাইব মক্কাধামে। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যেরা আমার সে সংকল্পেও বাধা দিল। ইহারাই বারুদখানা এবং ট্রেজারি ধ্বংস করিয়াছে, আমি তাহা হইতে কিছুই লই নাই এবং তাহারাও আমাকে কিছুই আনিয়া দেয় নাই। তাহারা একদিন রাণী জিনৎমহলের বাসস্থান লুট করিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। সুতরাং বেশ বোঝা যাইবে যে, এই সব বিদ্রোহী সৈন্যরা যদি আমার বাধ্য হইত, তাহা হইলে এই সব ঘটনা কি ঘটিতে পারিত? ইহা ছাড়া একথাও উল্লেখযোগ্য যে, দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও কেহ বলিতে পারে না যে, তোমার স্ত্রীকে আমরা বন্দী করিব।

হাবসী কামবার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমিই তাহাকে মক্কা যাইবার অনুমতি দিয়াছিলাম। আমি তাহাকে পারস্য দেশে পাঠাই নাই, কিংবা পারস্য সম্রাটের নিকট কোন চিঠিও আমি লিখি নাই। কোন লোক মিথ্যা করিয়া এই কথা রটনা করিয়াছে। মহম্মদ দরবেশের দরখাস্ত আমার লেখা নয়—সুতরাং তাহা বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। যদি আমার কোনও শত্রু কিংবা মিয়া হাসান আসবারির কোনও শত্রু এই দরখাস্ত পাঠাইয়া থাকে, তাহার উপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়। বিদ্রোহী সৈন্যেরা আমাকে কুর্নিশ পর্যন্ত করিত না।

তাহারা দেওয়ানী খাস এবং মসজিদের ভিতর জুতা পায়ে দিয়াই প্রবেশ করিত। যাহারা নিজেদের প্রভুদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের উপর কখনও কি বিশ্বাস স্থাপন করা চলে? আমাকেও তাহারা বন্দী করিয়া আমার নাম ব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়া তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করিত। আমি নিঃসহায়, নিরস্ত্র, অর্থহীন, গোলাবারুদ বা কোনও প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য না পাওয়া অবস্থায় নিজের ইচ্ছায় কি করিতে পারি? কিন্তু তাহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য কোন সময়েই দিই নাই। বিদ্রোহী সৈন্যদল যখন প্রথম আমার প্রাসাদের নিচে উপস্থিত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। প্রাসাদরক্ষীকে আমি তখনই সংবাদ দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকেও বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমি মহিলাদের নিরাপদে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দুইটি পালকি পাঠাইয়াছিলাম এবং প্রাসাদের দ্বার সুরক্ষিত করিবার জন্য দুইটি তোপ পাঠাইয়াছিলাম। সেই রাত্রেই আমি আগ্রাতে মহামান্য লেফটনাণ্ট গভর্নর সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থার বিবরণ দিয়া উটের পিঠে দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়াছিলাম। যতক্ষণ আমার হাতে ক্ষমতা ছিল, আমি যথাসাধ্য করিয়াছি। আমি নিজের ইচ্ছায় শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে যাই নাই; আমি সৈন্যদের কবলে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত কার্য করিয়াছি। যে কয়জন ভৃত্য আমার নিজের কাছে রাখিয়াছিলাম, তাহারা যাহাতে আমার জীবনরক্ষা করিতে পারে,

সেই কারণেই রাখিয়াছিলাম। তাহারাও যখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন আমি প্রাসাদ হইতে গোপনে চলিয়া গিয়া হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলাম। সেখান হইতেই আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয় এবং জানানো হয় যে, আমার জীবনের কোনও হানি করা হইবে না। আমি তৎক্ষণাৎ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট নিজেকে সমর্পণ করি। বিদ্রোহী সৈন্যরা তাহাদের সঙ্গে আমাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি যাই নাই।

এই বর্ণনাপত্রে যে সব কথা লিখিত হইল, তাহা সমস্তই আমার নিজের মুখের কথা হইতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একটিও মিথ্যা বা অসত্য কথা নাই। ভগবানের নাম লইয়া বলিতেছি যে, যাহা নিছক সত্য, আমি কেবল তাহাই বিবৃত করিয়াছি। প্রথমেই আমি শপথ করিয়া বলিয়াছি যে, আমি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলিব না, এক্ষণে তাহাই বলিলাম।

(স্বাক্ষর)

পুনশ্চ—বিদ্রোহী সৈন্যদের ক্রিয়াকলাপ এবং খাজা সাহেব এবং মক্কা যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া মির্জা মোগলকে আমি যে পত্র লিখিয়াছি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ঐরূপ কোনও পত্রের কথা আমার স্মরণ নাই। চিঠিখানিতে যে আদেশ দেওয়া আছে উহা উর্দু ভাষায় লিখিত। আমার সেরেস্তায় উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হয় না, সেখানে সবই ফার্সী ভাষায় লেখাপড়া হয়। সুতরাং কোথায় এবং কি ভাবে

ঐ পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। সংসারে বীতরাগ হইয়া আমি মক্কা যাইবার সংকল্প করায় মির্জা মোগল বোধ হয় ঐ পত্রখানি লিখাইয়া আমার সহিমোহর অঙ্কিত করিয়া থাকিবে। মোটের উপর বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি আমার বিরক্তি এবং আমার নিঃসহায় অবস্থাও ঐ পত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। অন্যান্য যে সব কাগজপত্র এই আদালতে দাখিল করা হইয়াছে, যথা—রাজা গোলাপ সিংকে লেখা চিঠিখানি, বখত খাঁর দরখাস্ত এবং তাহার উপর আমার সহি-মোহরের ছাপ, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, আমি এসব চিঠির কিছুই জানি না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্রোহী সেনাদল আমার অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত চিঠিপত্র লেখাইত এবং তাহাতে আমার সহিমোহরের ছাপ দিত। হয়তো যে সব চিঠিপত্র লিখিতে এবং স্বাক্ষর করিতে তাহারা আমাকে বাধ্য করিত, এগুলিও সেই ধরনের চিঠি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(স্বাক্ষর)

অতঃপর জজ এডভোকেট জেনারেল তাঁহার ভাষণ শুরু করিলেন।

॥ জজ এডভোকেট জেনারেলের ভাষণ ॥

মাননীয়গণ—এই বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমি পারিয়াছি, সেইগুলি

যথাযথভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কয়েক মাস সময় লাগিয়াছে, সে সময় শহরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতেছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, যে সকল ঘটনার বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা সমস্তই সত্য এবং তথ্য-পূর্ণ। যাঁহার বিচারের জন্য এই সভা গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি দোষী কিংবা নির্দোষী, ইহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে তাঁহার পদমর্যাদা এবং তাহার সুযোগ লইয়া যে সব অমানুষিক কীর্তিকলাপ সংঘটিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমেই, যে সকল কারণে এই নির্মম ঘটনাবলী, যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অভিনব বলিয়া মনে হইবে, এবং যাহা ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতিকেই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

ঠিক কি কারণে এবং কাহার দ্বারা এই অমানুষিক বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড প্রথমে শুরু হয় তাহার সঠিক সংবাদ সম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের প্ররোচনায় এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, এবং সে সকল তথ্য যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই তাহা নহে। তবে বর্তমানে আমি বলিতে চাই যে, দিল্লীর রাজসভায় এ সম্বন্ধে চক্রান্ত এবং গোপন পরামর্শ অনেক দিন হইতেই

চলিতেছিল। এই বিচারসভায় যিনি বন্দী তাঁর সম্রাট উপাধির দ্বারা তিনি ধর্মান্ধ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে উচ্চতম নক্ষত্ররূপে গণ্য হইতেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দিকেই চাহিয়া অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছে।

এইবার আমি ঘটনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

গত মে মাসে মীরাটে কার্টিজ ব্যবহার করিতে অসম্মত হওয়ায় 3rd Light Cavalryতে যে ৮৫জন সৈনিকের সেখানকার সামরিক আদালতে বিচার হয়, তাহাদের বিচারকের বাণী শুনাইয়া হাতে-পায়ে শিকল পরাইয়া প্যারেড গ্রাউণ্ডে ৯ই মে সকালে হাজির করা হয়। এই ঘটনার পরদিন সভায় অর্থাৎ ঠিক ৩৬ ঘণ্টা পরে ১০ই মে তারিখে মীরাটে তিনটি দেশীয় রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ৩৬ ঘণ্টা নিতান্ত অল্প সময় নয়, সুতরাং এই বিদ্রোহী দলের সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান অসম্ভব ছিল না। গাড়ী করিয়া মীরাট হইতে দিল্লী আসিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। বিদ্রোহীরা যে দিল্লীর 38th Native Infantry-র সঙ্গে কি করিয়া সংযোগ স্থাপন করিল, তাহার বিবরণ কাপ্তেন টিটলার ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গাড়ীবোঝাই বিদ্রোহীদল রবিবার সন্ধ্যায় 38th দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, রবিবার সন্ধ্যায় যে তাঁহারা সর্বপ্রথম মিলিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে

অবাধ্য সৈন্যগণের বিচার নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই তাহারা স্থির করিয়াছিল যে কার্টিজ ব্যবহারে যদি তাহাদের বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে মীরাট এবং দিল্লীর সমস্ত দেশীয় সৈন্যরা একত্রিত হইয়া বিদ্রোহী হইবে। আমরা এমন প্রমাণও পাইয়াছি যে, রবিবার সন্ধ্যার সময়েই দিল্লী প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যরা এ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দিল্লী বা মীরাটে এ সময়ে চর্বিমাখানো কার্টিজ একটিও ছিল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সকল কার্টিজ বহু কাল হইতে, বিভিন্ন কেল্লার বারুদখানায় যাহাদের দ্বারা প্রস্তুত হইত তাহারা সকলেই ঐ সব বিদ্রোহী সৈন্যদের স্বজাতীয় অথবা সমধর্মী। তাহারা যদি জানিত যে কার্টিজে আপত্তিকর পদার্থ আছে, তাহা হইলে তাহারাই কি উহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইত? দেখা গিয়াছে যে, এই সব কার্টিজ ব্যবহারে হিন্দু বা মুসলমান সৈন্যদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, কার্টিজ ব্যবহারের আপত্তি প্রকৃতপক্ষে গুরুতর বলিয়া তাহারা মনে করে নাই। আসলে তাহারা ইংরাজদের হত্যা করিয়া বর্তমান বিচারসভায় যিনি বন্দীরূপে উপস্থিত, তাঁহারই পতাকা-তলে উপস্থিত হইয়া, ইঁহারা যাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, সেই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই বিচারসভায় বহু কাগজ এবং চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোনও পত্রেই স্পষ্ট ভাবে দেখা

যায় না যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে ইহাদের অসন্তোষের কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কাজেই এই বিদ্রোহ এবং লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেন হইল এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। বিদ্রোহের সময় অন্যান্য সিপাহীদের উত্তেজিত করিবার সময় তাহারা সাড়ম্বরে চর্বি-মাখানো কার্টিজের কাহিনী শুরু করিয়াছে। অথচ আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, সে-সময়ে এ অঞ্চলে ঐ সব কার্টিজ মোটেই ছিল না। সুতরাং কি কারণে এই বিভীষিকার সৃষ্টি হইল, তাহাও এক বিচিত্র রহস্য। কার্টিজের ব্যাপার যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ঐ আপত্তিকর বস্তু ব্যবহার করিতে বিরত হইবার জন্য রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষের নিকট সামান্য একটি দরখাস্ত করিলেই যথেষ্ট হইত। সুতরাং আমার বিশ্বাস, এই বীভৎস ব্যাপারের অন্তরালে এমন একটা ষড়যন্ত্র আছে, যাহা কার্টিজ-কাহিনী অপেক্ষা অনেক অনেক গুরুতর।

যে আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা এই বিদ্রোহী শক্তিকে পরিচালিত করা হইয়াছে এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মম হত্যাকাণ্ড ও বীভৎস অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় আছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের বহু স্থানে যেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছে, সেখানে কার্টিজের কোনও উল্লেখই হয় নাই। ইংরাজদের হত্যা

করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে হইবে, এই অদম্য ইচ্ছাই বিভিন্ন স্থানের লোকদের প্রভাবিত করিয়াছে। তাহারা জানিয়াছিল যে, হত্যা, লুণ্ঠন এবং যে-কোন অত্যাচারই তাহারা করুক না কেন, কাহারও কাছে কোনও শাস্তিই তাহাদের পাইতে হইবে না। সুতরাং কার্টিজ ব্যবহারে আপত্তি করার জন্যই এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? কোনও গুরুতর ষড়যন্ত্র ব্যতীত একটা অতি তুচ্ছ কারণে কি এই নির্মম ব্যাপার ঘটিতে পারে? মীরাটের তিনটি বিদ্রোহী রেজিমেণ্ট এবং দিল্লীর কয়েকটি রেজিমেণ্ট একত্রে মিলিত হইলেও কি কখনও কল্পনা করিতে পারে যে, সেই শক্তির দ্বারা তাহারা ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে পারিবে?

মাননীয় বিচারপতিগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, যদি একথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, পূর্ব হইতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এবং রক্তপ্লাবী বিদ্রোহের কোনও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, তবু বর্তমান ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছাড়া এ ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। যে নৃশংসতার সহিত এই সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ যে আপত্তিকর কার্টিজ, ইহা কখনই হইতে পারে না। ১০ই মে তারিখে কার্টিজের ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটিতে আর সে কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। ৮৫জন সিপাহীকে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইতেছিল, তখনও কোন অসন্তোষের ধ্বনি

শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এবং 3rd Cavalry-র অবশিষ্ট সৈন্যগণ তখনও শান্ত ও নীতিবদ্ধ ভাবেই ছিল। ১১ই তারিখে দিল্লীতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার জন্য সিপাহীদের প্রস্তুত করিতে অনেকখানি সময় এবং অবসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাপ্তেন টিটলারের বিবৃতিতে সে কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে। পূর্বগঠিত একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া গাড়বোঝাই সিপাহীরা মীরাট হইতে দিল্লী আসিয়া বিদ্রোহের আগুন জ্বালিতে পারিত না।

মীরাটের বিদ্রোহ ব্যাপারে দেশীয় সৈনিকদের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সৈন্য এবং কর্মচারীদের ছাউনি হইতে দেশীয় সৈন্যদের ছাউনির দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। দেশীয় ছাউনিতে কোনও গোলমাল বা কলরব হইলে ইউরোপীয় ছাউনি হইতে তাহা শুনিতে পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। কোনও গোলযোগ বাধিলে ইউরোপীয় অফিসাররা স্বভাবতই তাহা মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু গোলযোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতেই অনেকটা সময় চলিয়া যায়। এদিকে দেশীয় সৈন্যেরা এই বিলম্বের সুযোগ লইয়া অনেক দূরে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে অফিসাররা দেশীয় ছাউনিতে গিয়া সিপাহীদের দেখিতে পান নাই এবং তাহাদের গতিবিধি সম্বন্ধেও কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সিপাহীরা এক এক দলে পাঁচ-ছয় বা

দশজনে মিলিয়া একটা গোপন স্থানে সমবেত হয়। তার পর রীতিমত সামরিক কায়দায় মার্চ করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়।

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই বিদ্রোহী সৈন্যদল দিল্লীতে আসিয়া এই মোকদ্দমায় যিনি বন্দী—তাঁহার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করে। এ ব্যাপারটা খুবই গুরুতর এবং বোঝা যায় যে পূর্ব হইতেই এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। সিপাহীদের প্রতি বন্দীর প্রকাশ্য সহানুভূতি এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে এইবার আমি আমার বক্তব্য বলিব।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বন্দীর চোখের সম্মুখে তাঁহার নিজের ভৃত্যেরাই ইউরোপীয়দের রক্তে কেল্লার মাটি রঞ্জিত করিল। যখন আমরা চিন্তা করি যে, সেই সব নিহতদের মধ্যে অসহায়া নারী এবং শিশু ছিল—যাহারা কখনই কোনও ক্ষতি করিতে পারিত না, তখনই এই ঘটনার দারুণ বীভৎসতার কথা এবং মানুষ যে কতখানি নৃশংস হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের হৃদ্‌কম্প হয়। আমরা ভাবিয়া পাই না যে এই বন্দী, যিনি শিক্ষিত বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন, যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব করেন, যিনি অভিজাত বলিয়া খ্যাত, বয়সের ভারে যিনি নত হইয়া পড়িয়াছেন, এই শুভ্রকেশধারী বৃদ্ধ—কি করিয়া তিনি নিজেকে এই বর্বরের মত কার্যে—যে কার্যের পরিচয় দিতে বন্যপশুরাও

ঘৃণা বোধ করে, তাহাতে নিজেকে জড়িত করিলেন।

তাইমুর রাজবংশের শেষ রাজা সত্যসত্যই এই নৃশংস ও ভয়াবহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাহাই আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর আলোচনা প্রয়োজন। যে সব হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি পরিষ্কার দিবালোকে, বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং অতি প্রকাশ্য ভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সব হত্যাকাণ্ড এই বন্দীর নিজের ভৃত্যদের দ্বারা প্রাসাদের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলা প্রয়োজন যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনেও দিল্লী প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে বন্দীর সার্বভৌম অধিকার ছিল। আমি অবশ্য একথা বলিতে চাহি না যে, এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্দী পূর্ব হইতেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। আমরা কেবল প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্য বলিব।

হাকিম আসানউল্লা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি এবং দরবারের উকিল গোলাম আব্বাস সম্রাটের নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ফটকের নিকট পড়িয়া আছে এবং বিদ্রোহীরা কাপ্তেন ডগলাসকে হত্যা করিতে ছুটিয়াছে। সম্রাটের পালকি-বেহারারা সেই সময়ে সেখানে আসে, তাহারাও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলে। তাহারা আরও জানায় যে, দ্বিতলে যে সব ইউরোপীয় নর-নারী আছেন, তাঁহাদের হত্যা

করিবার জন্য এক দল সেখানে যাইতেছে। বন্দীর নিজের ভৃত্যেরা এই সব বীভৎস হত্যাকাণ্ডে যে অংশগ্রহণ করিয়াছে, বন্দী সে কথা গোপন করিতেছেন কেন ? বন্দী বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের ভৃত্যেরা এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহা তিনি জানিতেন না এবং এ ব্যাপার কাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাও তিনি জানিতেন না। এত বড় একটা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করিবার কি তাৎপর্য ছিল ? এত দিন পরেও আমরা সহজেই জানিতে পারিয়াছি, কাহারা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল। সম্রাটের নিজের ভৃত্যেরাই এ কার্যে লিপ্ত ছিল, এ কথা স্থানীয় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যে সকল প্রমাণের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, সম্রাটের নিজের ভৃত্যেরাই এই সব হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমি সেই সব প্রমাণের মধ্য হইতে একটি মাত্র উল্লেখ করিব :—

"এই সময়ে ফ্রেজার সাহেব গোলমাল থামাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলাম যে হাজী নামক এক মণিকার তাহার তরবারির দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহের ভৃত্যেরা আসিয়া ভূপতিত ফ্রেজার সাহেবের উপরে ক্রমান্বয়ে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। ফ্রেজারের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিল হাবসী। এই ঘটনার পরেই তাহারা দ্বিতলের দিকে ধাবিত হইল। আমি তখন অন্য দ্বার দিয়া উপরে যাইয়া সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি

অন্যান্য দরজাগুলিও বন্ধ করিতেছিলাম, এমন সময় দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া তাহারা উপরে উঠিয়া পড়িল এবং যে ঘরে কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার হাচিনসন এবং মিস্টার জেনিংস ছিলেন, সেই ঘরে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেখানে দুইজন মহিলা ছিলেন, তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে হত্যা করা হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিলাম। আমি নিচে আসিবামাত্র মুণ্ডো নামা বাদশাহের এক ভৃত্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাপ্তেন ডগলাস কোথায় ?—বলিয়াই আমাকে ধরিয়া আবার উপরে লইয়া আসিল। আমি বলিলাম, তোমরাই তো তাঁহাদের সকলকে হত্যা করিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছ। উপরে আসিয়া দেখিলাম, কাপ্তেন ডগলাস তখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়াই মুণ্ডো তাহার তরবারির এক আঘাতে ডগলাসের মৃত্যু ঘটাইল।”

সুতরাং বেশ বোঝা যাইতেছে যে, বাদশাহের ভৃত্যবর্গই এই সব হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এইবার আসানউল্লা খাঁর উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যখন বন্দীর নিকট বিবৃত করা হইল তখন তিনি কি করিলেন ? তিনি তখন আদেশ দিলেন যে, প্রাসাদদুর্গের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই আদেশের অর্থ কি ? হত্যাকারীরা যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই কি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ? যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে উদ্দেশ্যে

ঐ আদেশ দেওয়া হয় নাই। হাকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বন্দী সেই সব অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করা বা শাস্তি দেওয়ার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই এবং বলিয়াছেন যে, চারিদিকে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছু করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বন্দী বাদশাহ নামে খ্যাত এবং তাঁহারই ভৃত্যেরা যদি তাঁহার পদমর্যাদার অবমাননা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুষ্কৃতদের শাস্তি দিয়া তাঁহার আত্ম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার সে সুযোগ তিনি ত্যাগ করিলেন কেন?

আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার ভৃত্যবর্গের দ্বারা এই যে নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহার আদেশ অনুসারে না ঘটিলেও এ ব্যাপারে তাঁহার সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এই ব্যাপারে অপরাধী কোনও ভৃত্যকে বরখাস্ত করা হয় নাই, এ বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করাও হয় নাই, বরং সেই সব দুষ্কৃত-দের বেতন দিয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল। এই সব প্রমাণের পরেও কি আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে বন্দী এ ব্যাপারে অপরাধী নন? দেশের আইন কি বলে, সে কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তার বাইরেও একটা উচ্চতর আইন আছে—সেটা বিবেকের আইন, বুদ্ধি-বিবেচনার আইন। সে আইনের শাস্তি পৃথিবীর মানুষের প্রদত্ত দণ্ড বিধানের চেয়ে অনেক অনেক ভয়াবহ। ভগবানের আইনকে কোনও মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না।

এইবার বারুদখানার ঘটনাবলীর দিকে আমরা মনঃসংযোগ করিব। কাপ্তেন ফরেস্ট বলিয়াছেন যে, সকাল ৯টার সময় মীরাট হইতে আগত বিদ্রোহীরা দলবদ্ধভাবে পোলের উপর দিয়া আসিতেছিল। তাহাদের পুরোভাগে ছিল অশ্বারোহী দল। এক ঘণ্টার মধ্যেই কেল্লার ফটকের বাহিরে প্রহরারত পদাতিক বাহিনীর একজন সুবেদার আসিয়া জানাইল যে, দিল্লীর সম্রাট বারুদখানা অধিকার করিবার এবং সেখানকার সমস্ত ইউ-রোপীয়দের রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন। এ আদেশ যদি অন্যথা করা হয়, তাহা হইলে কাহাকেও বারুদখানার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। অল্পক্ষণ পরেই সম্রাটের নিজস্ব সেনাবাহিনীর এক কর্মচারী তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া সেখানে আসিয়া সেই সুবেদারকে জানাইল যে, তাহার নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন।

সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, অত্যন্ত ব্যস্ততা এবং তৎপরতার সহিত বারুদখানা অধিকার করা হইয়াছিল। এবং এই কার্যের মূলে ছিল সম্রাট এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণের আদেশ। যে প্রণালীতে এই কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল, তাহার জন্য যে পূর্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভিতরের খবর সম্পূর্ণ ভাবে না জানা থাকিলে অন্য কাহারও পক্ষে এতখানি তৎপরতার সহিত এ কার্য করা সম্ভব ছিল না। তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা

বিবেচনায় বারুদখানাটি হস্তগত করা যে কতখানি প্রয়োজনীয় ব্যাপার, আশা করি এই আদালত সে কথা স্মরণ রাখিবেন। এই নরমেধ যজ্ঞের ব্যাপারে একজন সম্রাটকে তাহার মধ্যে লিপ্ত করার উদ্দেশ্য কি থাকিতে পারে? উপস্থিত বিপদ এবং নানা অসুবিধার তুলনায় তাঁহাকে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র দেখানো হইয়াছিল তাহা অকিঞ্চিৎকর। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবন, ধন-সম্পত্তি সবই বিপন্ন করিয়াছেন। কিসের জন্য? রাজমুকুটের জন্য?—না যে শাসনদণ্ড নিজের শিথিল হস্তে ধারণ করিতে তিনি অক্ষম, সেই দণ্ড ধারণ করিবার দুর্বার লোভের জন্য? এই জন্যই কি বৃদ্ধবয়সে তিনি নিজের সৈন্যদের দ্বারা সর্বপ্রথমে বারুদখানা অধিকার করিলেন? যখন বিদ্রোহের গুরুত্ব কেহই বুঝিতে পারেন নাই, যে সময়ে কেবলমাত্র অরাজকতা এবং লুটপাঠ সবে সুরু হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে যে গুরুতর বিপর্যয় ঘটিবে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কি তিনি এই কার্য করিয়াছিলেন?

আমরা শুনিয়াছি যে, বন্দী নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, পশ্চিম দিক হইতে এক প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস আসিয়া সব গ্রাস করিবে। বন্দীর ধর্মোপদেষ্টা হাসান আকসারি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অবিশ্বাসী ইংরাজদের বধ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং পারস্যের শাহ আসিয়া আবার হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বন্দীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

১১ই মে সোমবার কি ঘটিবে তাহা সম্রাটের জানা ছিল, এ কথা যদি সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আমি বলিব যে রাজপ্রাসাদের অন্য কোনও ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। রাজকুমার জওয়ান বখত ইংরাজদের হত্যা সম্বন্ধে যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, এই চক্রান্ত কেবল সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এবং ইহা কেবল তাহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হয় নাই। প্রাসাদের সকলেই এ ব্যাপার জানিতেন। ১১ এবং ২০ রেজিমেণ্টের পদাতিক দল যখন বারুদখানা আক্রমণ করিতে যায়, তখন এই বন্দী প্রকাশ্য ভাবেই তাহাদের উৎসাহ দেন এবং তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ক্রমে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন। বোধ হয় তখন মনে করেন নাই যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনের পরিবর্তে অন্য কোনও পরিণাম তাঁহার ভাগ্যে সঞ্চিত আছে।

এইবার আমি লেফটনাণ্ট উইলোবির কথা উল্লেখ করিব। তিনিই ছিলেন বারুদখানার অধ্যক্ষ। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মী ইংরাজ সৈন্য যখন দেখিলেন যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বারুদখানাকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, তখন তিনি এবং তাঁহার সাহসী বন্ধুগণ নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বারুদখানা উড়াইয়া দিলেন। তাঁহারা বীরগতি লাভ করিলেন। তাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করিবেন, আমার সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি এবারে অন্য

বিষয়ের অবতারণা করিব। বারুদখানা ধ্বংস করিবার পরেও ইংরাজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের গতিরোধ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজশক্তি তখন তাঁহাদের পক্ষে ছিল না, কাজেই পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কোনও উপায়ই তাঁহারা তখন দেখিতে পাইলেন না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লী শহরে বিদ্রোহীরা যে সব নৃশংস কাণ্ড করিল, তাহার তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। ঠিক এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, সম্রাট স্বয়ং এই বিভীষিকার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ১১ই মে অপরাহ্নে সম্রাট দেওয়ানী খাসের তক্তে বসিলেন এবং সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে একে একে অভিবাদন করিল এবং তিনিও তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের দরবারের আইন-বিশারদ গোলাম আব্বাস বলিলেন যে, প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া সম্রাটের আশীর্বাদ জ্ঞাপনের অর্থ হইল এই যে, আমি তোমাদের আনুগত্য গ্রহণ করিলাম। তখনই তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল কি না সে কথা গোলাম আব্বাস সঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার পুনরায় সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠার ঘোষণাস্বরূপ ২১ বার তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

এই সব ঘটনার দ্বারা বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগই প্রমাণিত হইতেছে।

দিল্লীর প্রাক্তন রাজা নামে অভিহিত মহম্মদ বাহাদুর শাহের

বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার প্রথমটি—

তিনি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পেন্সনভোগী হইয়াও ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে সেনাবাহিনীর সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও অনেককে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু অখ্যাত সৈনিক এবং কর্মচারীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন এবং যথোপযুক্তভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সব প্রমাণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও আমি এই বিচার-সভায় উপস্থাপিত করিয়া আপনাদের ক্লান্তি আনিতে চাহি না। কেবল যে সব প্রমাণ নথীভুক্ত হইয়াছে, সেইগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

এই বিচার-সভায় অভিযুক্ত মহম্মদ বাহাদুর শাহ কি ভাবে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পেন্সনভোগী হইয়াছেন, তাহার বিবরণ মিস্টার সণ্ডার্স (অস্থায়ী কমিশনার এবং লেফটনাণ্ট গভর্নরের এজেণ্ট) ব্যক্ত করিয়াছেন। অভিযুক্ত বাহাদুর শাহের পিতামহ শাহ আলম ১৮০৩ সালে যখন মহারাষ্ট্র বাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়া অসহায় জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তখন তিনি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় এবং সেই দিন হইতেই দিল্লীর সম্রাট বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পেন্সনভোগী প্রজা বলিয়া গণ্য হন। সুতরাং এই রাজবংশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বৃটিশ কর্তৃক

তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই এবং বৃটিশের নিকট হইতে তাঁহারা এ যাবৎ উপকারই পাইয়া আসিতেছেন। বন্দীর পিতামহ শাহ আলম সে সময় কেবল যে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন তাহা নয়, মহারাষ্ট্র বাহিনী কর্তৃক তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছিল, যতদূর অবমাননা সহ্য করা যাইতে পারে, তাহার অনেক বেশী তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং যথেষ্ট অমর্যাদার সহিত তাঁহাকে বন্দী-জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে, অমর্যাদা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে এবং তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁহাকে পেন্সন এবং হৃতগৌরবের অধিকারী হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই গৌরব, পেন্সন এবং পদমর্যাদা এই বন্দী তিন-পুরুষ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে আখ্যানোক্ত সর্পের মত তিনি ফণা বিস্তার করিয়া যাহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাহাদেরই দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং যাহাতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়, সেই ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সেনাবিভাগের সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁকে নিজের হাতে যে পত্র তিনি লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই পত্র আমি এই আদালতে দাখিল করিলাম—

"বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ মহিমান্বিত মহম্মদ বখত খাঁর প্রতি—

আমাদের শুভেচ্ছা জানিবে। নিমক হইতে আগত সৈন্যদল আলাপুরে পৌঁছিয়াছে কিন্তু তাহাদের মানপত্র সব এখানেই

রহিয়াছে। সে কারণ তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অবিলম্বে দুই শত সৈন্য এবং পাঁচ কিম্বা সাত দল পদাতিক লইয়া তাহাদের মালপত্র, তাঁবু, রসদ ইত্যাদি সমস্ত আলাপুরে নির্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। ইদগার নিকট যে সব অবিশ্বাসীর দল সমবেত হইয়াছে তাহারা যেন কোনমতেই অগ্রসর হইতে না পারে। সৈন্যদল যদি বিজয়ী হইয়া ফিরিতে না পারে বা তাহাদের যুদ্ধ উপকরণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহার ফল যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে সে কথা স্মরণ রাখিবে। এ বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। এই আদেশ যেন বিশেষ ভাবে প্রতিপালিত হয়।"

এ চিঠিতে কোনও তারিখ নাই, কিন্তু চিঠিখানিতে লিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।

বন্দী এই আদালতে তাঁহার যে লিখিত ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, তিনি ঘটনাচক্রে পড়িয়াই বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি পূর্বে কোনও সংবাদই পান নাই। বিদ্রোহী সেনানীরা তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টিত করে এবং তিনি নিজের জীবন বিপন্ন মনে করিয়া নিজের মহলে চলিয়া যান। বিদ্রোহী সৈন্যরা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলকেই বন্দী করে, সে সময় তিনি উপর্যুপরি দুইবার তাহাদের অনেক অনুরোধ করিয়া সেই সব বন্দীদের জীবন রক্ষা করেন। তৃতীয় বারে তাঁহার অনুরোধ,

অনুনয় সব ব্যর্থ হয়, বিদ্রোহীরা তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াই তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে সেই সব অসহায় নরনারীর হত্যা সাধন করে।

বন্দীর এ উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার কথার সমর্থনে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। বরং তাঁহার লিখিত যে সব আদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বর্ণনার অসত্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের পক্ষ সমর্থনে তিনি সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নিজের যে কোনও ক্ষমতাই ছিল না, এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। নিজের স্বাক্ষর বা নিজের সীলমোহরকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না, সেজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, বাধ্য হইয়াই তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং তাঁহার বিনা অনুমতিতেই তাঁহার সীলমোহরের ছাপ চিঠির উপর অঙ্কিত হইয়াছে।

কিন্তু বন্দী যদি অসহায় হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে যাওয়া এবং পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসা তাহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল? তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা জোর করিয়া কিংবা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে হুমায়ুন-সমাধিভবনে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসা কিরূপে সম্ভব হইল? তাঁহার জবানবন্দীতে তিনি বলিয়াছেন যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন ইতস্তত ঘোরাফেরা করিতেছিল,

তখন আমি সুযোগ পাইয়া প্রাসাদের জানালা দিয়া বাহিরে আসিয়া হুমায়ুনের সমাধি-ভবনে চলিয়া গেলাম।

বিদ্রোহী সৈন্যদের কবল হইতে যদি তিনি মুক্ত হইতে চাহিতেন, তাহা হইলে দিল্লী-প্রাসাদে থাকাই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। যাই হোক, তাঁহার জবানবন্দীর প্রতি ছত্র লইয়া আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার নাই। তাঁহার প্রতি আনীত অভিযোগের প্রথম দফা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমি অতঃপর অভিযোগের দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বন্দী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের বিভিন্ন সময়ে বন্দী তাঁর পুত্র মির্জা মোগল—তিনিও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের একজন প্রজা—এবং দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু লোক—সকলেই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রজা, তাহাদের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত এবং যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়াছিলেন।

এ অভিযোগ সম্বন্ধে প্রমাণ ও চিঠিপত্র এত বেশী সংখ্যায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে যে, তাহার সবগুলি লইয়া আলোচনা করা সম্ভব নয়।

তখনকার সংবাদপত্রগুলিতে প্রচার হইয়াছিল যে, মির্জা মোগল প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই

পদের উপযুক্ত পরিচ্ছদ উপহার পাইয়াছেন। জনশ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিলেও অসংখ্য চিঠিপত্র হইতে দেখা যায় যে, পুত্র মির্জা মোগল তাঁহার পিতা বাহাদুর শাহের পরেই দিল্লীর বিদ্রোহী-গণের নেতা। উদাহরণস্বরূপ কেবল একখানি মাত্র পত্র—নজলগড়ের দারোগা মৌলভী মহম্মদ জহর আলি লিখিত—এই বিচারসভায় পেশ করিব।

পত্রখানি এই :—

"সম্রাট! জগতের আশ্রয় সমীপে—

সম্রাটের আদেশ নজলগড়ের সমুদয় ঠাকুর, চৌধুরী, কানুনগো ও পাটোয়ারীদের পরিষ্কার ভাবে জানানো হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা সবই করা হইয়াছে। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাদের বলা হইয়াছে যে তাহাদের বেতন এই জেলার রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে নিয়োজিত কয়েক জন গাজী যতক্ষণ উপস্থিত না হইতেছেন, ততক্ষণ এই অধীন ভৃত্যের বিবরণ হয়তো বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। এই অধীন গোলামের আরও নিবেদন এই যে, লাগলি, কাকরৌলা, দাচাউ, কালান এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ফলাফলের কথা বিবেচনা না করিয়াই লুটপাঠ আরম্ভ করিয়াছে।"

এই একখানি চিঠি হইতেই বন্দীর বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় অভিযোগ আনীত হইয়াছে, অর্থাৎ বন্দী তাঁহার পুত্র মির্জা

মোগল এবং দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু লোককে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া যায়।

উপরোক্ত ঐ পত্রের উপর বন্দী স্বহস্তে তাঁহার পুত্র মির্জা মোগলকে লিখিত আদেশ দিতেছেন যে, একদল সৈন্য অবিলম্বে নজলগড়ে পাঠানো হউক এবং তাহারা দরখাস্তকারীকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহের কাজে সাহায্য করুক।

আরও একখানি পত্র সম্প্রতি আমার হাতে আসিয়াছে। এখানি এই আদালতে ইতিপূর্বে দাখিল করা হয় নাই, কিন্তু এখন আপনাদের সমক্ষে ইহা পাঠ করাই ভাল। এই চিঠিখানি ১২ই জুলাই তারিখে থুরজপুরার পুত্র আমীর আলি কর্তৃক লিখিত—

"হে সম্রাট, পৃথিবীর আশ্রয়—

অধীনের নিবেদন যে, সে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়াছে, যে দরবারে স্বয়ং দরিয়ুম দ্বারীর কার্য করিতে গর্ববোধ করিতেন। এই অধীন সম্রাটের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতেও দ্বিধা বোধ করে না এবং সম্রাটের আবাসভূমি—যেখানে স্বর্গের দূতেরা সর্বদা দ্বাররক্ষা করিতেছে, সেইখানে ঘৃণিত ইংরাজেরা যুদ্ধসজ্জা করিতেছে দেখিয়া অধীন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর আলো দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই অধীন ভৃত্য সিংহের ন্যায় যুদ্ধে অগ্রসর হইবারই শিক্ষা পাইয়াছে, শৃগালের ন্যায় পলায়নের শিক্ষা পায় নাই।

"সুতরাং যদি সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই দীন ভৃত্যকে যুদ্ধচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিন দিনের মধ্যেই শ্বেতচর্মধারী ভাগ্যহতদের নির্মূল করিয়া দিতে পারে।"

এই দরখাস্তের উপর বন্দী পেন্সিলে স্বহস্তে লিখিয়াছেন, মির্জা জহুরুদ্দিন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দরখাস্তকারীকে নিযুক্ত করিবেন।

বন্দী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ ঃ—তিনি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রজা হইয়াও রাজ-আনুগত্য বর্জন করিয়া বিশ্বাসঘাতকরূপে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং সেই দিনই অন্যায়-ভাবে দিল্লী শহর অধিকার করেন। ইহা ছাড়া ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের পুত্র মির্জা *মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও বহু বিশ্বাস-ঘাতকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ* এবং যুদ্ধ *ঘোষণা* করেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পুর্ণভাবে সিদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত করেন।

বন্দী বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পেন্সনভোগী, এ কথা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগের আলোচনার সময় বলা হইয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বন্দীকে বা তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও প্রতি কোনও অসৎ আচরণ করেন নাই বরং তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইয়া পেন্সন ও বহুবিধ সুবিধার

আকারে বহু লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আমরা দেখিতেছি, যাহাদের নিকট উপকৃত, সেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেই উচ্ছেদ করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতক-দের মত এই বন্দী অগ্রসর হইয়াছেন।

গোলযোগের প্রথম দিনে অপরাহ্নেই তিনি বিদ্রোহী সেনাদলের আনুগত্য গ্রহণ করেন দেওয়ানী খাসে। তাহাদের মাথার উপর হাত রাখিয়া নিজেও তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। তাঁহার ন্যায় একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া, ন্যুব্জ দেহে সম্রাটের ভূমিকায় এত বড় লোমহর্ষণ পৈশাচিক হত্যা-কাণ্ডের সমর্থন করিয়াছেন। মানুষের অন্তঃকরণে বিবেক *বলিয়া যে বস্তু আছে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিসর্জন দিয়া যে সব নরহন্তার দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের* মধ্যমণি হইয়াছিলেন।

তিনি নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রত্যক্ষদর্শী আছে। বন্দীর উকিল স্বীকার করিয়াছেন যে, ১১ই মে তারিখেই তিনি সম্রাটরূপে ঘোষিত হন। গোলাপ নামা একজন রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, সেই দিন অপরাহ্ন তিনটার সময় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সর্বত্র ঘোষণা করা হয় যে, এখন হইতে এই বন্দীরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। চুনী নামা আর এক ব্যক্তি বলে যে, ১১ই তারিখের মধ্যরাত্রে কুড়িটি

তোপধ্বনি সে তাহার বাড়ী হইতে শুনিয়াছিল এবং তাহার পরদিন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় যে, সাম্রাজ্য এখন তাঁহার হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি সেই দিনই অন্যায় ভাবে দিল্লী শহর অধিকার করেন। এ সম্বন্ধে বলিবার বা প্রমাণ দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাইবে।

অভিযোগের পরবর্তী অংশ—এই বন্দী ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে তাঁহার পুত্র মির্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও বহু বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

মির্জা মোগল প্রকাশ্য ভাবেই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং এই উপলক্ষে কয়েক দিন পরেই এক রাজকীয় শোভাযাত্রা বাহির হয়। এ ব্যাপারের একজন প্রত্যক্ষদর্শী চুনীলাল সাক্ষ্য দিয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন্ তারিখে ঐ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহা সে বলিতে পারে নাই। এই নিয়োগের পরেই মির্জা মোগল যুদ্ধ ব্যাপারে সর্বাধিনায়ক হইয়া ওঠেন। তার পর সৈন্যাধ্যক্ষ বখত খাঁ উপস্থিত হইলে তিনিই প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান শাসক পদে নিয়োজিত হন। (Commander-in-Chief and Lord Governor General) তাঁহার

আগমনের তারিখ ১লা জুলাই। তাঁহার আগমনে মির্জা মোগল অসন্তুষ্ট হন। কারণ ১৭ই জুলাই তারিখে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছেন যে, শহরের বাহিরে ইংরাজদের আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় বখত খাঁ তাহাদের অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন এবং জানান যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত সৈন্যেরা যেন অগ্রসর না হয়। তাহার ফলে সেই সেনাবাহিনীকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা বিবৃত করিয়া মির্জা মোগল জানাইয়াছেন যে, এরূপ আচরণে যে কোনও ব্যক্তি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন, সুতরাং পরিষ্কার ভাবে আদেশ দেওয়া হোক যে সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত অধিনায়ক কে।

এই পত্রের উপর সম্রাটের কোনও লিখিত আদেশ দেখা যায় না, তবে ১৮ই তারিখেই দেখা যায় যে, মির্জা মোগল এবং বখত খাঁ উভয়েই একযোগে মিলিত হইয়াছেন। ১৯শে তারিখে একখানি চিঠিতে মির্জা মোগল তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছেন, "গত কল্য হইতে আমাদের আক্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। দিনে বা রাত্রে আমরা আক্রমণ করিতে পারি। আলাপুর অঞ্চল হইতে আমরা যদি সাহায্য পাই, তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপায় এবং সম্রাটের মহিমায় আমাদের জয় নিশ্চিত। সে কারণ আমার প্রার্থনা যে, সাহায্য পাঠাইবার জন্য বেরিলির সৈন্যাধ্যক্ষকে সম্রাটের নিকট হইতে আদেশ দেওয়া হউক। তিনি তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া আলাপুরের দিকে অগ্রসর হউন

এবং সেই দিক হইতে অধিবাসীদের আক্রমণ করুন। আপনার এই ভৃত্য এদিক হইতে আক্রমণ করিবে এবং এই উভয় দল দুই এক দিনের মধ্যেই নরকের কীটদের নরকে পাঠাইতে সক্ষম হইবে। আলাপুরগামী সৈন্যদল শত্রুর রসদ বন্ধ করিয়া দিতেও পারিবে।"

এই পত্রের উপর সম্রাটের স্বহস্ত-লিখিত আদেশ আছে—"মির্জা মোগল যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিবেন।" আরও একটি আদেশ সেই পত্রে দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহা মির্জা মোগলের দ্বারা লিখিত—"বেরিলির সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দেওয়া হউক।"

আমার বিবেচনায় তিন জনের একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করা এবং একমত হওয়ার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও দু' খানি পত্র আমি এই আদালতে পেশ করিতে চাই। একখানি মহম্মদ বখত খাঁর একটি ঘোষণা-পত্র—ইহার তারিখ ১২ই জুলাই। ইহাতে লিখিত আছে—

"জায়গীরদার, বৃত্তিভোগী এবং নিষ্কর সম্পত্তি-ভোগীদের এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, যদি দেখা যায় যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন অথবা তাহাদের নিকট কোনরূপ সংবাদ সরবরাহ করিয়া বা জিনিসপত্র দিয়া কোনও ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষমা করা হইবে না। এই ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁহাদের জানানো যাইতেছে যে, তাঁহারা এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন যে,

যখন সম্পূর্ণ ভাবে আমরা জয়ী হইব, তখন তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভাবে ফেরৎ দেওয়া হইবে (অবশ্য নিজ নিজ স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলাদি দেখাইতে হইবে) এবং যদি বর্ত্তমান গোলযোগের আগে তাঁহারা কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। এই ঘোষণাপত্রের পরেও যদি প্রমাণিত হয় যে কোনও ব্যক্তি ইংরাজদের নিকট কোনও সংবাদ বা অন্য কোনরূপ সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। নগরের কোতোয়ালকে এতদ্দারা জানানো যায় যে, তিনি প্রত্যেক জায়গীরদার বা নিষ্করভোগীর স্বাক্ষর এই ঘোষণাপত্রের পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া ইহা মহামাননীয় সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিবেন।"

অপর পত্রখানি ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বয়ং সম্রাটের স্বাক্ষর-সম্বলিত। তাহাতে লেখা আছে—

"তোমাকে জানানো যাইতেছে যে, বাদ্যযন্ত্র দ্বারা শহরময় ঘোষণা করিবে যে ইহা ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) এবং ধর্মরক্ষার জন্যই আমরা এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এই নগরে বা নগরের বাহিরে বিভিন্ন গ্রামসমূহের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান অথবা সারা হিন্দুস্থানের যে সকল অধিবাসী আমাদের বিপক্ষে এবং ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধে সমবেত হইয়াছে, তাহারা নেপালবাসী হউক বা শিখ হউক বা হিমালয়বাসী হউক, সকলেই যেন ইংরাজ বা তাহাদের কর্মচারীদের বধ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম

রক্ষার সহায়তা করে। তাহাদের এই অভয়বাণী জানানো হউক যে, ইংরাজদের ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। যে মুহূর্তে তাহারা ইংরাজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাদের পক্ষে যোগদান করিবে, সেই মুহূর্তেই তাহাদের সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে এবং যাহাতে তাহারা নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান বজায় রাখিতে পারে, তাহার সমুদয় ব্যবস্থাই করা হইবে। তাহারা ইংরাজ-শিবির হইতে লুণ্ঠন করিয়া যদি কিছু সম্পত্তি আহরণ করিয়া থাকে, তাহাও তাহারা নিজেদের অধিকারে রাখিতে পারিবে। ইহা ছাড়াও সম্রাটের নিকট হইতে যথাযোগ্য পুরস্কারও তাহারা পাইবে।"

এই পত্রখানি সম্রাটের প্রধান কোতোয়ালী হইতে অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে কোতোয়ালীর সীলমোহর দেওয়া আছে এবং সহকারী নগরপাল ভাউ সিং ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা নৃপ-আদেশের অবিকল প্রতিলিপি। বন্দীর বিরুদ্ধে যে তৃতীয় অভিযোগটি ছিল, এই পত্রখানি সে সম্বন্ধেও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চতুর্থ অভিযোগের শেষের অংশ সম্বন্ধেও এ প্রমাণটি প্রয়োগ করা যায়। আরও বহু চিঠিপত্র আছে, কিন্তু সেগুলি আমি আদালতে দাখিল করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

চতুর্থ অভিযোগের প্রতি আমি এই বিচারসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বন্দী ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে এবং ঐ

সময়ের দিল্লীপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে উনপঞ্চাশ জন খাস ইউ-রোপীয় এবং মিশ্রিত ইউরোপীয় নরনারীর নির্মম হত্যাসাধনের সহায়তা করেন।

এই সব হতভাগ্য নরনারীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই। সেই বিভীষিকাময় ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এই বিচারসভার অবিদিত নয় এবং সে ঘটনা ভুলিবারও নয়। যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার ফলে নারী এবং শিশুদেরও তরবারির মুখে আহুতি দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ধর্মযুদ্ধ বলা চলে না। সে কার্য এতই পৈশাচিক ও বীভৎস যে, বিভিন্ন স্থানে একই রকমের পৈশাচিক ঘটনা যদি না ঘটিত, তাহা হইলে ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মনে দ্বিধা জন্মিত। এই ভীতিপ্রদ দুর্ঘটনার উদাহরণ দেওয়াও মর্মান্তিক। আমাদের দেখাইতে হইবে যে, সেই উনপঞ্চাশ জন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এই বন্দী কতখানি সংশ্লিষ্ট। এই সকল নারী ও শিশুদের হত্যার ব্যাপারের প্রতি-ঘটনাটির সঙ্গে বন্দীর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহারই আলোচনা করিব। তাহাদের বন্দী করা, আটক রাখা, নির্যাতন করা এবং অবশেষে তাহাদের চরম পরিণতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথমেই চিকিৎসক আসানউল্লা খাঁর উক্তির প্রতি আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, এতগুলি ইংরাজ রমণী ও বালক-বালিকাদের প্রাসাদের মধ্যে আনিয়া আটক রাখা হইল কেন? তিনি

উত্তরে জানাইলেন যে, বিদ্রোহীরা শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে উহাদের সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রাসাদের মধ্যে যখন তাহারা নিজেদের বাসস্থান স্থির করিয়া লয়, তখন উহাদেরও লইয়া আসে। অতঃপর তাহারা সেই সব বন্দীদের নিজেদের হেফাজতে না রাখিয়া সম্রাটের আদেশ প্রার্থনা করে। তিনি আদেশ দেন যে, রন্ধনশালায় ঐসব বন্দীদের স্থান দেওয়া হউক, কারণ সেখানে পর্যাপ্ত স্থান পাওয়া যাইবে।

এই বিচারসভার অবগতির জন্য আমি জানাইতে চাই যে, আসানউল্লার বক্তব্য জানিবার পর আমি নিজে সেই স্থানে গিয়া তাহার পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করিয়াছি। স্থানটি চল্লিশ ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া এবং প্রায় দশ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। উহা পুরাতন, নোংরা এবং উহার দেওয়ালগুলি চুন-বালি-বর্জিত। অন্ধকার, মেঝে খারাপ, জানালা নাই এবং আলো-বাতাস যাইবারও কোন রাস্তা নাই। মিসেস এল্ড্‌ওয়েল এখানে বন্দী ছিলেন, তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন :—

"আমাদের সকলকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হইল। সে ঘরে কোনও জানালা ছিল না। মাত্র একটি দরজা ছিল। ঘরটি মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তার উপর আমরা অনেকে একত্রে সেই ঘরে ছিলাম। সিপাহীরা মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের এবং ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইত। তাহার ফলে সেই একটি মাত্র দরজাও আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত, তাহার ফলে আলো বা বাতাস কিছুই পাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাহীরা

তাহাদের বন্দুক লইয়া আমাদের ভয় দেখাইয়া বলিত যে, আমরা যদি মুসলমান হইয়া বন্দীরূপে থাকিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সম্রাট আমাদের প্রাণ-ভিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু সম্রাটের খাস সেনাদল বলিত যে, আমাদের টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া কাক-চিলদের আহার্যে পরিণত করা হইবে। আমাদের কদর্য আহার দেওয়া হইত, তবে দুইবার সম্রাট আমাদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

এই বন্দী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য ইংরাজ গভর্নমেণ্ট যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর তিনি দিয়াছেন বটে! একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, এই বন্দী-পরিবারস্থ মহিলাগণ যেখানে থাকেন, সেখানে বহু লোকের আশ্রয় অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার প্রাসাদ-মধ্যে এমন সব গুপ্তগৃহ আছে যেখানে পাঁচ শত নরনারীকে নিরাপদে রাখা যাইতে পারে এবং সে সব স্থানে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করিতে সাহস করে না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বন্দীর প্রাসাদদুর্গে এমন বহু ঘর আছে, যেখানে ঐসব রমণী ও শিশুদের বেশ ভাল ভাবেই রাখা যাইতে পারিত। কিন্তু এই বন্দী সে সব কিছুই করেন নাই। ইংরাজ নরনারী ও শিশুগুলির জন্য এমন স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যেখানে শৃগাল-কুকুরেও থাকিতে ঘৃণা বোধ করে। বহু টাকা পেনসন, রাজপ্রাসাদে অবস্থান এবং ইংরাজ গভর্নমেণ্টের বদান্যতার উপযুক্ত প্রতিদানই এই বন্দী দিয়াছেন! আসানউল্লা খাঁ এবং

মিসেস এলড্রেল উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সব ব্যবস্থার জন্য দায়ী এই বন্দী স্বয়ং।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অতি সামান্য সামান্য ব্যাপারের জন্য তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাহারই প্রত্যেকটিতে তিনি স্বহস্তে আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত ব্যাপার যে তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ অনুযায়ী ঘটিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আলোচ্য ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি স্বয়ং বন্দীশালা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। হতভাগ্য বন্দিনীদের উপর যে সতর্ক প্রহরীরা নিয়োজিত ছিল, তাহারা সম্রাটের নিজেরই লোক। তাহাদের যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহাও সম্রাটের নির্দেশেই দেওয়া হইত; এমন কি মাত্র দুই বার অপেক্ষাকৃত ভাল খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছেন। প্রহরীগণ বন্দিনীদের বার বার বলিয়াছে যে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে সম্রাট তাহাদের মার্জনা করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন এই যে, এমন একটি ঘটনাও কি দেখা গিয়াছে—যাহাতে এই বন্দী ঐসব নর-নারীর প্রতি একটু সদয় ব্যবহারের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বা তাহাদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? মোটেই না। ঐসব নারী ও শিশুদের জন্য তিলে তিলে নির্মম মৃত্যু, নয়তো তরবারির আঘাতে মৃত্যু—ইহা ভিন্ন অন্য কোন গতিই ছিল না।

আমার মনে হয়, এই বন্দীর সম্বন্ধে এই আদালত কি রায়

দেন, তাহা জানিবার জন্য এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করা উচিত। প্রমাণের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। গোলাপ নামে এক চাপরাসী বলিয়াছে যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার দুই দিন পূর্বেই সে জানিতে পারিয়াছিল যে, উহাদের হত্যা করা হইবে এবং সেদিন বহু লোক ঐ নির্মম কাণ্ড দেখিবার জন্য রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়াছিল। আরও অনেক সাক্ষী এই কথা সমর্থন করিয়াছে। এমন কি, সকাল আটটা হইতে ন'টার মধ্যে যে এই নরমেধ যজ্ঞ করা হইবে সে সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ বা সৈন্যমণ্ডলী সহসা বিক্ষুব্ধ হওয়ায় যে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা নয়। সাক্ষী বলিয়াছেন যে, স্বয়ং সম্রাট অথবা মির্জা মোগল এই উভয়ের মধ্যে একজনের আদেশ ব্যতীত এই নির্মম কাণ্ড কিছুতেই হইতে পারিত না। সাক্ষী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, ইউরোপীয় বন্দীদের একত্র দাঁড় করাইয়া তাহাদের চারিদিকে সম্রাটের সৈন্যরা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহীদলের সৈন্যরাও ছিল, সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর সৈন্যরাও ছিল। হঠাৎ এক সময়ে সকলে নিজ নিজ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিল।

সংবাদ-সরবরাহকারী চুনীলালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কাহার আদেশে এই পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে? তিনি বলেন যে, একমাত্র সম্রাট ছাড়া আর কেহই এরূপ আদেশ

দিতে পারেন না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে প্রাসাদের ছাদ হইতে মির্জা মোগল এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

সম্রাটের আদেশেই এই নির্মম কার্য করা হয় এবং মির্জা মোগল ইহার অন্যতম দর্শক ছিলেন, এ কথা সম্রাটের কর্মচারী মুকুন্দলালও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিন দিন যাবৎ এই সব বন্দীদের সংগ্রহ করা হয়। মির্জা মোগল কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে সম্রাটের নিকট আসিয়া ইহাদের হত্যা করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্রাট তখন মহলের মধ্যে ছিলেন। মির্জা মোগল এবং বসন্ত আলি খাঁ মহলের ভিতর যান। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং বসন্ত খাঁ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সম্রাট বন্দীদের হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে রাজসভার দিনলিপি বা ডায়েরী আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সম্বন্ধে আসানউল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাজসভায় কি নিয়মিত ভাবে দিনলিপি রাখা হয়? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, হাঁ হয়। বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই রাজসভার দিনলিপি প্রত্যহই লেখা হইয়া থাকে। তখন দিনলিপির একখানি পৃষ্ঠা তাঁহাকে দেখানো হইলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহই রাজসভার দিনলিপি লিখিয়া থাকে, ইহা তাহারই হস্তাক্ষর এবং ইহা সেই দিনলিপিরই একখানি পৃষ্ঠা।

১৬ই মে, ১৮৫৭ তারিখের ডায়েরীর অনুবাদ আমি পাঠ করিতেছি—

"দেওয়ানী খাসে সম্রাট দরবার আহ্বান করিলেন। উনপঞ্চাশ জন ইংরাজ বন্দী হইয়াছেন; সৈন্যরা প্রার্থনা করিল যে তাহাদের হাতে ঐসব বন্দীদের সমর্পণ করা হউক। সম্রাট তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বলিলেন, সেনাবাহিনী উহাদের সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। বন্দীরা তখন তরবারির আঘাতে নিহত হইল। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।"

যে সব মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণগুলি এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। বন্দীর আত্মপক্ষ সমর্থনে যে লিখিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি মিথ্যার জাল বোনা হইয়াছে মাত্র এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব সাংঘাতিক প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থ অভিযোগের শেষ অংশ সম্বন্ধে এইবার আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

এ বিষয়ে আমি মাত্র তিনখানি পত্রের প্রতি এই বিচার-সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনখানি পত্রই এই বন্দী কর্তৃক লিখিত। একখানি লিখিত হইয়াছে কচ্ছভোজের শাসনকর্তা রাওভারাকে, আর একখানি যশলমীরের অধিপতি রণজিৎ সিংকে, তৃতীয়খানির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জম্মু কাশ্মীরের রাজা

গুলাব সিং।

রাওভারাকে লিখিত পত্রখানি এইরূপ—

"আমার কাছে সংবাদ আসিয়াছে যে চিরবিশ্বস্ত তুমি, তোমার অধিকার সীমার মধ্যে সমস্ত অধিবাসীদের তরবারির মুখে আহুতি দিয়া তোমার অধিকৃত রাজ্য কলঙ্কমুক্ত করিয়াছ। তোমার এই পত্রে তোমাকে সম্মান জানানো হইতেছে। তোমার রাজ্যের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে ঈশ্বরের ভক্তগণ যেন কোনরূপে লাঞ্ছিত বা অপদস্থ না হয়। অবিশ্বাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত কোনও লোক যদি সমুদ্রপথে তোমার রাজ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধ্বংস করিবে। ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিল।"

যশলমীরের অধিপতি রণজিৎ সিংকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রখানি—

"আমাদের বিশ্বাস যে তোমার রাজ্যের মধ্যে অবিশ্বাসী ইংরাজ সম্প্রদায়ের এক প্রাণীও বর্তমানে নাই। যদি লুক্কায়িত ভাবে কিংবা পলাতকরূপে কেহ এখনও থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তারপর তোমার রাজ্য পরিচালনার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোমার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমাকে আমাদের বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া তোমার পদমর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।"

তৃতীয় পত্র—জম্মুর অধিপতি রাজা গুলাব সিংকে লিখিত।

"তোমার দরখাস্ত দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার রাজ্যে অভিশপ্ত ও অবিশ্বাসী ইংরাজদের কি ভাবে নিধন করিয়াছ। এ জন্য তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানানো যাইতেছে। সাহসী ব্যক্তির যাহা করা উচিত, তুমি এই কার্যের দ্বারা তাহাই করিয়াছ। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাক। সম্রাটের নিকট তোমাকে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে। আসিবার পথে অবিশ্বাসী ইংরাজ-দের অথবা শত্রুপক্ষীয় অন্য ব্যক্তিদের পাইলেই হত্যা করিবে। তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ রাজসম্মান দেওয়া হইবে এবং পদমর্যাদা দেওয়া হইবে, যাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না।"

এগুলি ব্যতীত এই বন্দীর নিকট চতুর্থ সেনাবাহিনীর এক দফাদারের একখানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সে ব্যক্তি মজঃফরনগরে তাহার সেনানায়ককে হত্যা করার সংবাদ জানাইয়াছে। সেই দরখাস্তের উপরে এই বন্দী স্বহস্তে আদেশ দিয়াছেন যে, দরখাস্তকারীকে যোগ্যপদে নিযুক্ত করা হউক।

বন্দীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন এই বিচারসভা সিদ্ধান্ত করিবেন যে, এই বন্দী এখনও সম্রাটের পদমর্যাদা এবং শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী কিংবা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একজন অন্যায়কারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। আপনারাই স্থির করিবেন যে, তাইমুর রাজবংশের শেষ অধিপতি বার্ধক্যের এবং দুর্ভাগ্যের তাড়নায় অবনত এই বন্দী, এইবার তাঁহার

পূর্বপুরুষের এই প্রাসাদভবন ত্যাগ করিয়া যাইবেন কি না এবং এই সুন্দর দেওয়ান-ই-খাস, ন্যায়বিচারের জন্য যে স্থান সুবিখ্যাত, যেখানে ন্যায়ের মান হিসাবে ইহাই নির্ধারিত হইবে যে, রাজাও যদি অপরাধী হন এবং দুষ্কার্যে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে রাজবংশের সমস্ত গরিমার অবসান একদিনেই ঘটিয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইয়া গেলেও এখন যদি আমি বিদ্রোহের কারণ এবং সে ব্যাপারের পূর্বকল্পিত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে হয়তো তাহা অনধিকারচর্চা হইবে না।

আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, কার্টিজ ব্যাপার উদ্ভূত হইবার পূর্বে দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে যদি কোন কারণে মনোবিকার না ঘটিত, তাহা হইলে হয়তো এই সর্বব্যাপী বিদ্রোহ সংঘটিত হইত না। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বহু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বিস্তার করিবার মূলে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরস্পরের মধ্যে গোপনে একটা বোঝাপড়া এবং প্রস্তুতি, যাহাকে সাধারণ ভাষায় ষড়যন্ত্র বলা যাইতে পারে, তাহা ক্রমবর্ধমান হইতেছিল, নচেৎ এত বড় ঘটনা ঘটিতে পারিত না। এ ঘটনার জন্য কেবল কার্টিজের ব্যাপারের উল্লেখ করা ভুল। চিঠিপত্র এবং গোপন সংবাদাদি সম্বন্ধে এই বিচারসভায় আমি যে সব কথা বলিয়াছি, তাহাতে মনে করা

যাইতে পারে যে, এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে কার্টিজ একটা সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র—বারুদের স্তূপে ইহা একটা স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। যে সব প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, ১০ই মে তারিখের পূর্ব হইতেই ইংরাজের বিরুদ্ধে এ দেশের লোকের মনোভাব বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বার্থান্বেষী কতকগুলি লোক তাহারই সুযোগ লইয়া সেই বিদ্বেষের আগুন দেশব্যাপী করিয়াছিল। অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটিশ শাসনের অন্তর্গত করা এই ঘটনার আর একটি কারণ। ভারতে মুসলমান-অধিকৃত শেষ চিহ্নটুকুর অবলুপ্তি তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। জাঠমল নামে একজন সাক্ষীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে একজন হিন্দু সিপাহী এবং একজন হিন্দু ব্যবসায়ী—উভয়ের মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে বৃটিশ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান ভাবেই পোষণ করিয়াছে। একথা যে সত্য তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য এক সময়ে গর্ব করিবার বস্তু ছিল, কিন্তু তাহাদের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতায় সে গর্ব আমাদের চূর্ণ হইয়াছে।

দেশীয় সিপাহীরা বিশ্বস্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নীতিবোধ ছিল কম। তাহাদের বিশ্বস্ততা কতকটা অভ্যাসবশত, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ছিল তাহারও উর্ধ্বে।

কাজেই যাহাদের মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে, তাহারা এই সব দুর্বলতার সুযোগ সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। তিন চার জন দলপতি যদি একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া তোলে, অবশিষ্ট সৈন্যরা হয়তো তখনই তাহাতে যোগদান করিবে না। কিন্তু তাহারা সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বাধা দিবে না ইহাও নিশ্চয়। তাহারা মনে করে যে, ধর্মের দিক দিয়াই হউক বা কর্তব্যের দিক দিয়াই হউক, ঐসব দলপতিরা কার্যে যোগ না দিলেও বাধা দেওয়া তাহাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়। এইভাবেই বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে। কয়েক জনের খেয়ালের ফলে যে আগুন জ্বলে তাহাতে ভস্মীভূত হয় অনেকে। সাম্প্রতিক বিদ্রোহ যে এই উপায়েই দেশব্যাপী হইয়াছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার দুই এক মাস পূর্বে সিপাহীদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা মিলাইয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, একটা চক্রান্ত নেপথ্যে রূপায়িত হইতেছিল। অযোধ্যাপ্রদেশ সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সেই ঘটনা এবং ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোচিত সম্প্রদায় পুঁথিতে পড়িয়াছিল যে, লোকের মনে শিক্ষার আলো প্রকাশিত হইলে ধর্মের গোঁড়ামির ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং জাতিধর্মের অজুহাত তুলিয়া তাহারা লোকের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টির সুযোগ লইতে ভোলে নাই। এমন কি, হিন্দু বিধবাদের পুনরায়

বিবাহ দেওয়া হইবে, হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমতার দৃষ্টিতে সেনাবাহিনীতে রাখা হইবে, ইত্যাদি ব্যাপার ধর্মের দোহাই দিয়া নানা ভাবে প্রচার করা হয়।

ইহার ফলে ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান সিপাহী একত্র মিলিত হইল। সেনাবাহিনীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ছিল না, একই প্রকারের সাজসজ্জা, একই কর্মপদ্ধতি, একই রকমের পারিতোষিক ও পদোন্নতি। এমন কি পরস্পরের ধর্মোৎসবে পরস্পর যোগদান করিত। এই অবস্থায় উত্তেজনার আগুন ধূমায়িত হইতে হইতে তাহা একদিন জ্বলিয়া উঠিল।

কাজেই আবার আমি বলিতেছি যে, চর্বিমাখা কার্টিজ এই মর্মান্তিক ঘটনার একটি সামান্য উপলক্ষ মাত্র। পূর্ব হইতেই এই ঘটনার প্রস্তুতি চলিতেছিল।

এই বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহ এ ষড়যন্ত্রে অনেকদিন হইতেই লিপ্ত ছিলেন। হাসান আসকারী এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনে এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা চলিত। সিদি কামবারকে তিনি পারস্যে ও কনস্তান্তিনোপলে পত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে পত্রে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল— যাহাতে তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুতরাং দেশব্যাপী এই বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের মূলে এই বন্দীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, সিদি কামবারকে পারস্য ও কনস্তান্তিনোপলে পাঠানো হয় ঠিক দুই বৎসর পূর্বে এবং ঐ দুই দেশের সাহায্য লইয়া তাহার দেশে

ফিরিবার তারিখ নির্ণীত হয় ঠিক যে সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে। এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি জনপ্রবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সমাপ্তি ঘটিবে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই মুসলমানরা তাহাদের পূর্ণ আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। মোল্লা হাসান আসকারীও এই বন্দী সম্রাট এবং তাঁহার পরিষদদের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার এক স্বপ্নদর্শনের কাহিনী বিবৃতি করিয়াছিলেন। এ সব ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন মনের উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। তাহাদের মনে এই বিশ্বাস কখনও হইয়াছিল যে এই ভবিষ্যদ্বক্তা স্বর্গের দেবদূতগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে সক্ষম।

২৭শে মার্চ ১৮৫৭ তারিখে মহম্মদ দরবেশ নামে এক ব্যক্তি লেফটনান্ট গভর্নর মিঃ কলভিনকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে জানানো হয় যে, হাসান আসকারী সম্রাটকে জানাইয়াছেন যে, পারস্যের যুবরাজ বুশায়ার অধিকার করিয়া সেখানকার খ্রীশ্চানগণকে কতক নিহত কতক বন্দী করিয়াছেন এবং পারসীক সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই কান্দাহার এবং কাবুলের পথে দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইবে। পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে পারসীকগণের আগমন সম্বন্ধে দিবারাত্র আলোচনা

চলিতেছে। হাসান আসকারী নাকি প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া জানিয়াছেন যে, পারস্য-সম্রাটের রাজ্য শীঘ্রই দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং তিনি সারা হিন্দুস্থান অধিকার করিবেন। দিল্লী সম্রাটের পূর্ব গৌরবও আবার ফিরিয়া আসিবে, কারণ পারস্যরাজ তাঁহারই মাথায় ভারতের রাজমুকুট স্থাপন করিয়া যাইবেন। লেখক বলিয়াছেন যে, এই সংবাদে প্রাসাদে আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে এবং সম্রাট ইহাতে বিশেষভাবে তুষ্ট হন, এবং এজন্য বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা করা হয়। হাসান আসকারীও প্রতিদিন সূর্যাস্তের দেড় ঘণ্টা পূর্বে বিশেষ ভাবে উপাসনা করিতে থাকেন—যাহাতে পারসীকগণ সত্বর আসিয়া পড়ে এবং খ্রীশ্চানগণকে বিতাড়িত করে। এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার সম্রাট নানাবিধ উপঢৌকন ও উপচার হাসান আসকারীর নিকট পাঠাইতেন।

সুতরাং এই বিদ্রোহ-ব্যাপারে ধর্মান্ধতা কতখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহা বোঝা যায়। আমরা যদি সে সময়ে এই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাইতাম যে খ্রীশ্চানগণকে নির্মূল করিবার জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমাদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন স্থানে খ্রীশ্চানদের প্রতি শাস্তিমূলক অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসবগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইউরোপীয়দের প্রতি এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রকৃত মনোভাব যে এতখানি বিরূপ এ কথা পূর্বে

বিশ্বাস করাও অসম্ভব ছিল।

মিসেস এল্‌ড্‌ওয়েলের নিকট হইতে আমরা জানিয়াছি যে, মহরম পর্বের সময় শিশুদের প্রার্থনাবাণীর সঙ্গে ইংরাজদের প্রতি জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যখন অসহায় নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন প্রায় দুইশত লোক উপস্থিত থাকিয়া সেই সব হতভাগ্য-দের প্রতি অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল।

এইবার চাপাটি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এই বস্তুটি স্থান হইতে স্থানান্তরে চালান দেওয়া হইত। তাহার অর্থ এই যে, সকলের মধ্যেই এক ধর্ম এবং এক খাদ্য অথবা এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিবামাত্র সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াইত কিনা তাহা বলা কঠিন। কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্দেহাতীত এই সামান্য বস্তুটির সাহায্যে ভাবের আদানপ্রদান যে কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাও নির্ণয় করা সহজ নয়। ময়দার সঙ্গে হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করা হইয়াছে—এ সংবাদ এই সময়েই প্রচার করা হয়। অথচ এগুলির উদ্দেশ্য কি তাহাও বোঝা কঠিন। লোকের মনে সাধারণতঃ একটা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? আমার মনে হয়, কর্তৃপক্ষ চাপাটির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের গুঁড়ার কাহিনীর সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারের অন্তরালে যে কোন উর্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তির কৃতিত্ব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সময়ের প্রকাশিত

দেশীয় সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে নীরব ছিল না। চাপাটি, ময়দায় হাড়ের গুঁড়া, কার্টিজে চর্বি—হিন্দুদের উত্তেজিত করিবার পক্ষে এই অস্ত্রগুলি অমোঘ। কিন্তু মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার কার্যে সংবাদপত্রগুলি অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।

একখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, পারস্য-সম্রাট টেহারানে তাঁহার সমস্ত সৈন্যদের সমবেত হইবার আদেশ দিয়াছেন এবং প্রকাশ যে, কাবুলের দোস্ত মহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হইবে। কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, পারস্য-সম্রাটের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানে আসিয়া ইংরাজদের বিতাড়িত করা।

২৬শে জানুয়ারী, ১৮৫৭ তারিখের আর একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ যে, ফরাসী সম্রাট এবং তুর্কীর সুলতান পারসীক ও ইংরাজদের যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করিবেন না, যদিও লোকের ধারণা যে উভয়েই পারস্য-পক্ষ সমর্থন করিবেন। রুশিয়া যে অর্থ এবং সৈন্য দ্বারা পারস্যরাজকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত এ কথা সকলেই জানে। রুশিয়া পারস্যের মাধ্যমে হিন্দুস্থান জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।

এই সব বর্ণনার পরে পত্রিকা সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা দেখিবার জন্য সকলে প্রস্তুত থাকুন।

আর এক সংখ্যায় দেখা যায় যে, পারস্যরাজ ভারত জয় করিয়া তাঁহার সভাসদদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের শাসনভার ন্যস্ত

করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। একজন পাইবেন বোম্বাই, একজন কলিকাতা, আর একজন অধিষ্ঠিত হইবেন পুনায়। তবে সারা হিন্দুস্থানের রাজমুকুট অর্পিত হইবে দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহের শিরে।

এই সব সংবাদপত্র রাজপ্রাসাদে পাঠানো হইত এবং এই সব বিবরণ পড়িয়া এই বন্দী এবং তাঁহার অনুচরেরা কিরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্যার থিয়ো-ফিলাস মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এদেশীয় লোকদের মধ্যে পারসীক সৈন্য কর্তৃক হিরাট অধিকার এবং রুশীয়দের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব খুব আলোচনা হইত। এমন কি, সিপাহীদের মধ্যেও জনরব উঠিয়াছিল যে, পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যেই এক লক্ষ রুশীয় সেনা ভারত আক্রমণ করিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য উপস্থিত হইবে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আভ্যন্তরিক ষড়যন্ত্রের প্রভাবে সারা দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কার্টিজের ব্যাপারটা এই বিরাট ঐতিহাসিক ওলটপালটের একটা উপলক্ষ মাত্র।

আর একখানি সংবাদপত্রে আরও একটি চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইল। হানসী জেলায় এক গ্রামে এক রমণী তিনটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই কন্যাত্রয় কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল। একজন বলিল, আগামী বৎসর দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দিন, অনেক অঘটন ঘটিবে। দ্বিতীয় বলিল, যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে তাহারাই সেই সব প্রত্যক্ষ

করিবে। তৃতীয় শিশুটি বেশ গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, হিন্দুরা যদি এ বৎসর হোলিতে আগুন জ্বালায়, তাহা হইলে তাহারা বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

কোনও ইউরোপীয়ের কাছে এই কাহিনী যদি বলা যায়, তাহা হইলে তিনি হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু এ দেশের অশিক্ষিত লোকেদের মনে এই শিশুত্রয়ের কাহিনীর সঙ্গে হিরাট অধিকার এবং রুশীয় সৈন্যের আগমন এবং ভারতের রাজমুকুট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সব জনশ্রুতির সঙ্গে হাসান আসকারীর স্বপ্নকাহিনী এবং সিদি কামবারের দৌত্য অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করে। এই সব সংবাদপত্র এবং তাহাতে এই সব অলৌকিক কাহিনীর প্রচারের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, ইহা কখনই কল্পনা করা যায় না। মোখাসাহেবের স্বপ্ন, প্রাসাদের গুপ্তগৃহে মন্ত্রণা এবং সংবাদপত্রে এই সব প্রচারকার্য—এগুলি কি সবই কাকতালীয়?

১৯শে মার্চ তারিখের আর একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ—নয় শত পারসীক সৈন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর নেতৃত্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং আরও পাঁচ শত সৈন্য নানাপ্রকার ছদ্মবেশে দিল্লী শহরের মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সংবাদের প্রচারক সাদিক খাঁ নামে এক ব্যক্তি। তাহাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই ধরনের সংবাদ-প্রচারের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে—জনমণ্ডলীর অন্তরকে বিষাক্ত করা

ছাড়া ? সাদিক খাঁর নাম সম্বলিত একখানি ইস্তাহার ইতিপূর্বে জুম্মা মসজিদে প্রচারিত হইয়াছিল। সাদিক খাঁ নামটি ছদ্মনাম কি না বলা যায় না, কিন্তু এ সবের মূলে কাহার উৎসাহ রহিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার জন্য এই সকল সংবাদপত্রে যে সব অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জিত সংবাদ এবং বিভিন্ন স্থানে যে সব ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সবগুলির তালিকা করা অথবা সেগুলিকে এই বিচারসভায় উপস্থিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও কোনও দ্বিধা নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমি কেবল আর একটিমাত্র সংবাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

এটির তারিখ ১৩ই এপ্রিল। এটির সম্বন্ধে স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফ বলেন যে, বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ আরম্ভ হইবার প্রায় ১৫ দিন পূর্বে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে নগরপালের নিকট একখানি বেনামী দরখাস্ত পৌছিয়াছে যে শহরের কাশ্মীর গেটটি ইংরাজের কবল হইতে এখনই মুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। দিল্লী শহরের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের সহিত প্রধান সংযোগ-সূত্র। কেবল এইখানেই সৈন্য পাহারা আছে। সুতরাং ইহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা সকলের উপলব্ধি করা উচিত।

স্যার থিয়োফিলাস বলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে এরূপ বেনামী দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। তবু এই

ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে বোঝা গেল।

সেই সংবাদপত্রখানিতে আরও লিখিত ছিল যে, আর এক মাসের মধ্যেই কাশ্মীরের উপর যে দুর্ধর্ষ আক্রমণ হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

এই সংবাদটুকু সাঙ্কেতিক ভষায় লেখা, তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। কাশ্মীর শব্দের অর্থ দিল্লীর কাশ্মীর গেট। এক মাস পরে সেখানে যে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম হইবে তাহা সংবাদপত্র-লেখক কি উপায়ে জানিতে পারিল এ রহস্যের সমাধান করিবে কে? সত্য সত্যই 'এক মাস পরে' অর্থাৎ ১১ই মে তারিখে কাশ্মীর গেটের উপর যে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে।

বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহের সহিত সমস্ত ঘটনাবলীর যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাহার অসংখ্য প্রমাণ এখনও দিতে পারা যায়। হাবসী মৌজুদ নামে এক ব্যক্তি এই বন্দী সম্রাটের খাস গোলাম ছিল। সে ব্যক্তি একদিন মিস্টার এভারেটকে গোপনে বলিয়াছিল যে, তিনি অবিলম্বে কোম্পানির চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সম্রাটের শরণাপন্ন হইলে ভাল হয়। বিস্মিত এভারেটের প্রশ্নের উত্তরে সে ব্যক্তি বলিল যে, গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদ রুশসৈন্য দ্বারা অধিকৃত হইবে। এভারেট অবশ্য এ কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সামান্য একজন ভৃত্যের মুখের এই সাবধান-বাণীর

অন্তরালে কত বড় সুদূরপ্রসারী এক চক্রান্ত বর্তমান ছিল। এ ঘটনার কিছু পরে সেই ভৃত্য মৌজুদ পুনরায় এভারেটকে বলে যে, পূর্বেই আপনাকে কি আমি সাবধান করিয়া দিই নাই?

সম্রাটের মুন্সী মুকুন্দলালের নিকট আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিন বৎসর পূর্বে দিল্লীর কতকগুলি সেনানী সম্রাটের খাস সৈনিকরূপে আনুগত্য স্বীকার করে। সম্রাট তাহাদের আদেশপত্র দেন এবং তাঁহার খাস সৈনিকের চিহ্নস্বরূপ গোলাপী রংয়ের বস্ত্রখণ্ড দেন। তাহার কিছু পরেই সিদি কামবারকে দৌত্যে পাঠানো হয়। সুতরাং তিন বৎসর পূর্ব হইতেই এই ষড়যন্ত্রের সূচনা হইতেছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

*

এই সকল বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই বন্দীর বিরুদ্ধে যে চারিটি অভিযোগ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও পাঁচটি বিষয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাতে বোঝা যায় যে দেশব্যাপী এই বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে বন্দী বহু দিন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন।

১। হাসান আসকারীর স্বপ্নকাহিনী ও অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার।

২। সিদি কামবারকে পারস্যে এবং কনস্তান্তিনোপলে পাঠানো।

৩। হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত বিদ্বেষ এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রচার।

৪। মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ প্রচারকার্য—সংবাদপত্র ও ইস্তাহার-আদির সাহায্যে।

৫। দেশীয় সেনাবাহিনীর হিন্দু ও মুসলমান সেনানীগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উত্তেজিত করা।

এই পাঁচটি বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

আরও একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে ওঠা স্বাভাবিক। এই সব ব্যাপারে এই বন্দী কি নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, না তাঁহাকে বাধ্য করিয়া ইহাতে লিপ্ত করা হইয়াছিল ?

এই সব ব্যাপার কি তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত, না অন্য কোনও শক্তির হাতে তিনি ক্রীড়াপুত্তলী রূপে পরিণত হইয়াছিলেন ? তাঁহার ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া কি এই ব্যাপারে ধর্মাচার্যগণ সেই সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছিলেন ?

মুসলমানগণের ধর্মান্ধতা, আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র এবং এই বন্দীর সক্রিয় সহযোগিতা—এই সব গুলির সমন্বয়ে এই মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। রাজবংশের উত্তরাধিকারী অপেক্ষা মুসলমান ধর্মের অন্যতম নেতারূপেই এই বন্দীর প্রভাব বিস্তার করিতে একদল ইচ্ছুক ছিলেন। ফলে উভয় ভাবেই তিনি এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সহকর্মী হইয়াছিলেন।

পেশোয়ারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহম্মদ তকি বেগ ব্রিটিশের বেতনভোগী হইয়াও প্রচার করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই রাষ্ট্রে একটা পরিবর্তন ঘটিবে এবং ব্রিটিশ শক্তি শীঘ্রই বিতাড়িত

হইবে। করিম বক্স নামে দিল্লী বারুদখানার আর এক কর্মচারী, তিনিও ব্রিটিশের বেতনভোগী হইয়া সৈন্যদলের মধ্যে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানান যে, কার্টিজে সত্য সত্যই চর্বি মাখানো আছে এবং এ বিষয়ে ইংরাজ কর্মচারীরা যতই প্রতিবাদ করুক না কেন, তাহাতে কেহ যেন বিশ্বাস না করে। বিদ্রোহী সৈন্য যখন বারুদখানা আক্রমণ করে তখন এই ব্যক্তিই তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কার্য করিয়াছিল। ইংরাজদের কর্মচারী হইয়াও সে ইংরাজধ্বংসী বিদ্রোহীদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হইয়াছিল।

এরূপ উদাহরণের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। মুসলমানদের মধ্যেও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অভাব ছিল না। কলভিন সাহেবকে মহম্মদ দরবেশ নামে এক ব্যক্তি যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। একজন মুসলমান যে ব্রিটিশের প্রতি কতখানি বিশ্বস্তভাব পোষণ করিতে পারে, উহা তাহারই উদাহরণ। নবি বকস খাঁ সম্রাটকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, নারীহত্যা করা ধর্মবিগর্হিত কার্য। ইংরাজের প্রতি মুসলমানেরা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

আমার বক্তৃতায় ১৮৫৭ সালের যে ভয়াবহ ঘটনাবলী ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কারণস্বরূপ বহু উদাহরণ এবং বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। সেই বক্তৃতায় ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই বন্দী ভারতে মুসলমান ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি

হইয়াও দেশব্যাপী এক বিরাট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন। এই ব্যাপারে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির এবং মুসলমান সম্প্রদায় কি ভাবে দেশের জনমণ্ডলীকে এবং সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়াছেন—তাহারও বিবরণ আমার বক্তৃতায় দিয়াছি। তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যদের কার্টিজ সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তেজিত করিয়া তোলা হয়, কিন্তু এই বাহিনীর সেনাদলের কোন নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্ম ছিল না এবং তাহাদের পক্ষে কার্টিজে গরুর চর্বি কিংবা শূকরের চর্বি মাখানো হইল, তাহাতে তাহাদের সংস্কারে কিছুমাত্র আঘাত করিত না। কাপ্তেন মার্টিনো বলেন যে, আম্বালার মুসলমান সৈন্যরাও কার্টিজে চর্বির উল্লেখে হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও তাহাদের কোন দিন ছিল না। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কার্টিজ কাহিনীর অন্তরালে অন্য একটা প্রচ্ছন্ন অগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। হিন্দু সিপাহীদের ভয় দেখানো হইয়াছিল যে, তাহাদের জাতি ও ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে। হিন্দনের যুদ্ধের পর বহুসংখ্যক হিন্দু সৈন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতারণা করা হইয়াছে এবং তাহাদের যদি ক্ষমা করা হয়, তাহা হইলে তাহারা আবার ইংরাজ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে প্রস্তুত।

এই বিচারসভায় আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, স্বপ্নদর্শী একজন মুসলমান মৌলভী পারস্য ও তুর্কীর সুলতানগণের কাল্পনিক

সাহায্যের চিত্র প্রকাশ করিয়া এবং দিল্লীর বাদশাহের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনার কাহিনী প্রচারের দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে কাপ্তেন মার্টিনোর উক্তি সম্বন্ধে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, খ্রীশ্চান মিশনারীরা দেশীয় সিপাহীদের খ্রীশ্চান ধর্মগ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন বা তাহাদের ধর্মান্তরিত করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ কোন সময়ে আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে কি না। তিনি প্রত্যুত্তরে দৃঢ়স্বরে জানান যে, এরূপ কোনও অভিযোগ তিনি পান নাই এবং এরূপ অভিযোগ হইবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, সিপাহীরা জানিত যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা খ্রীশ্চান ধর্মের বিধি নয়। সুতরাং এ জনরব অলীক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এই বিচারসভা যেরূপ ধৈর্যের সহিত আমার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। দোভাষীরূপে মিস্টার মারফি যেরূপ দক্ষতার সহিত সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকেও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এ দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। সাক্ষীদের জবানবন্দী, চিঠি ও সর্ববিধ কাগজপত্র যেরূপ সুন্দরভাবে অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার উর্দু ও পারস্যভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা

থাকিতে পারে না। আমার বক্তৃতার সঙ্গে যে সব চিঠিপত্র এই বিচারসভায় দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি অতি মূল্যবান। সেই সমস্ত চিঠিপত্র অতি সুন্দর ভাবে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য।

(জজ এডভোকেট জেনারেল মেজর এফ জে হ্যারিয়ট তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে অসংখ্য চিঠি-পত্র, সংবাদপত্র, দরখাস্ত বিচারসভায় উপস্থিত করা হয়। তা ছাড়া অসংখ্য সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়। তার মধ্যে কেবল মিসেস এল্ড্‌ওয়েল এবং মিস্টার সাণ্ডার্স—এই দুজনের বক্তব্যের মর্মানুবাদ দেওয়া হল।)

॥ মিসেস এল্ড্‌ওয়েলের সাক্ষ্য ॥

[স্বামীর নাম আলেকজাণ্ডার এল্ড্‌ওয়েল—গভর্নমেণ্টের পেনসনভোগী।]

প্রশ্ন। ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে আপনি কি দিল্লীতে ছিলেন?

উত্তর। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। আপনি কোথায় থাকিতেন? ঠিক কোন্ সময়ে আপনি শুনিতে পান যে মীরাট হইতে বিদ্রোহী সেনাদল দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছে?

উত্তর। আমি দিল্লী শহরের দরিয়াগঞ্জ নামে পল্লীতে থাকিতাম। ১১ই মে তারিখের সকালে আটটা হইতে নয়টার মধ্যেই আমি শুনিতে পাইলাম যে বিদ্রোহী সেনাদল আসিয়াছে।

প্রশ্ন। আপনি সে দিন যাহা দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করুন।

উত্তর। আমার একজন সহিস আসিয়া সংবাদ দিল যে, সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া মীরাট হইতে দিল্লী আসিয়াছে এবং পথে আসিতে আসিতে তাহারা যে কোনও ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইয়াছে তাহাকেই হত্যা করিয়াছে। সে বলিল যে বিদ্রোহীরা দিল্লী শহরেও যে সব ইউরোপীয় আছে তাহাদেরও হত্যা করিবে। সুতরাং আমাদের গাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখা হউক এবং আমরাও দূরে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। আমি যখন এই ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিলাম, তখন আমার প্রতিবেশী মিস্টার নাউল্যান বলিলেন যে, সহিস যাহা বলিয়াছে সবই সত্য এবং এ বিষয়ে তিনি আমার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করিতে চান। তাঁহারা উভয়ে আলোচনার পর স্থির করিলেন যে, পল্লীর মধ্যে আমাদের বাড়ীটি সকলের চেয়ে বড় এবং দৃঢ়, সুতরাং পল্লীতে যে কয়জন ইউরোপীয় আছেন তাঁহারা সকলেই এখানে আসিয়া সমবেত হোন এবং যতক্ষণ সম্ভব অথবা যতক্ষণ না সাহায্য আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করুন। মিঃ এলড্‌ওয়েল এবং মিঃ নাউল্যান পার্শ্বে অবস্থিত একটি হাসপাতালে যাইয়া সেখানে প্রহরারত সিপাহীদের

জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে কি না ; কিন্তু সিপাহীরা জবাব দিল, তোমাদের কাজ তোমরা দেখ, আমাদের কাজ আমরা দেখিব। তখনও বিদ্রোহী সিপাহীরা এদিকে আসে নাই। সুতরাং হাসপাতালের ঐ সব রক্ষী সিপাহীদের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ঘটিয়াছে তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষীয় সমস্ত ইউরোপীয়েরা আমাদের বাড়িতে সমবেত হইয়া দ্বারগুলি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের দ্বিতলে পাঠানো হইল। আমাদের সংখ্যা তখন পুরুষ, স্ত্রী ও বালক-বালিকা সমেত সর্বসুদ্ধ ত্রিশজনেরও বেশী। বেলা ন'টার সময় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বিদ্রোহী সৈন্যেরা যমুনার পুল পার হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী পদাতিক দুইই ছিল। আমাদের বাড়ি নদীর নিকটেই, সুতরাং বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া জেলের দিকে চলিয়া গেল। শোনা গেল, তাহারা কয়েদীদের মুক্ত করিয়া দিবে। কিছু পরেই শুনিতে পাইলাম যে তাহারা শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং ইউরোপীয়দের হত্যা করিতেছে। এই সময়ে একজন মুসলমান রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কোথায় ইউরোপীয়েরা ? মিস্টার নাউল্যান তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া তাহাকে গুলী করিলেন। তার পরেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক আমাদের ফটকের নিকট সমবেত হইল।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় একজন মুসলমান মিসেস ফুলন নামে এক মহিলাকে আমাদের বাড়িতে লইয়া আসিল। এই মহিলাটির মাথায় গুরুতর ভাবে আঘাত করা হইয়াছে এবং তাঁহার বাড়ি লুণ্ঠিত হইয়াছে। বেলা তিনটা পর্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য গোলমাল শুনিতে পাই নাই। তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমাদের পল্লী ভূমিসাৎ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা কামান আনিতে গিয়াছে। আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, এই সময়ে ছেলেমেয়েদের লইয়া অন্যত্র যাইয়া আত্ম-গোপন করাই ভাল। আমি এবং আমার তিনটি সন্তান তখন দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দুইখানা ডুলিতে উঠিয়া সম্রাটের পৌত্র মির্জা আবদুল্লার বাড়িতে গেলাম। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাত্রি আটটা পর্যন্ত আমরা সেখানে থাকিলাম। সেই সময় মির্জা আবদুল্লা আসিয়া বলিলেন, তাঁহার শাশুড়ীর বাড়ি আরও নিরাপদ, আমাদের তিনি সেখানে লইয়া যাইবেন। আমরা অগত্যা সেখানে গেলাম। আমাদের জিনিসপত্র মির্জা সাহেবের বাড়িতেই থাকিয়া গেল, কারণ তিনি বলিলেন যে জিনিসপত্র রাস্তা দিয়া এ সময়ে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। পরদিন সন্ধ্যার সময় মির্জা সাহেবের এক খুল্লতাত এবং কয়েক জন ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আমাদের এখনই এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। চাকরদের হাতে রক্তমাখা তরবারি দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম। তাহারা

বলিল, সমস্ত খ্রীশ্চানদের হত্যা করিতে হইবে, ইহাই তাহাদের প্রতি আদেশ। তাহাদের অনুরোধ করিয়া সেই রাত্রি সেখানে থাকিবার অনুমতি পাইলাম। রাত্রে আমার মুন্‌সী আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অন্যত্র আশ্রয় পাওয়া সম্ভব কি না। সে বলিল যে সে জানিয়াছে নবাব আহম্মদ আলি খাঁ নাকি ইউরোপীয়দের আশ্রয় দিতেছেন। সে নবাবের অনুমতি আনিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া সে জানাইল যে নবাব সাহেবের বাড়িতে ইউরোপীয়েরা লুক্কায়িত আছে—এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীরা সেখানে কামান আনিয়া বসাইয়াছে। তার পর সংবাদ পাইলাম যে কয়েক জন খ্রীশ্চান রাজপ্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছে এবং স্বয়ং সম্রাট তাহাদের নিরাপত্তার ভার লইয়াছেন; সুতরাং আমাদের উচিত কোনও রূপে সেখানে যাইয়া আশ্রয় লওয়া। বুধবার রাত্রে আমার দর্জি এবং কাদিরদাদ খাঁ নামা একজন সেনানীর সাহায্যে আমরা রাজপ্রাসাদে নীত হইলাম। আমাদের মির্জা মোগলের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি আদেশ দিলেন, যেখানে অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দীরা আছে সেইখানে আমাদের লইয়া যাওয়া হউক। ১৩ই মে বুধবার রাত্রে আমাদের সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম বালক-বালিকা ও নারী সব মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন বন্দী রহিয়াছে। আমাদের একটি অন্ধকার ঘরে স্থান দেওয়া হইল। ঘরে মাত্র একটি দরজা, কোনও জানালা নাই। মানুষ-বসবাসের উপযুক্ত সে ঘর নয়। মাঝে মাঝে সিপাহীরা আসিয়া আমাদের

এবং ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইতে লাগিল, তাহার ফলে সেই একটি মাত্র দরজাও বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। সিপাহীরা বন্দুক লইয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা যদি মুসলমান এবং ক্রীতদাস হইতে স্বীকৃত হই, তাহা হইলে সম্রাট আমাদের জীবনভিক্ষা দিবেন। আবার একদল সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল যে আমাদের টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া কাক-চিলের আহার্যে পরিণত করা হইবে।

বৃহস্পতিবার কয়েক জন সিপাহী আসিয়া জানাইল যে, বারুদ দিয়া আমাদের আশ্রয়কক্ষ উড়াইয়া দিয়া আমাদের সকলকে হত্যা করা হইবে। আমাদের অতি কদর্য আহার্য দেওয়া হইত। মাত্র দুই বার সম্রাট আমাদের ভাল খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্রাটের এক সেনানী আসিয়া মিসেস স্টেনসকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি ইংরাজের হাতে রাজক্ষমতা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা সিপাহীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে? মিসেস স্টেনস উত্তর দিলেন, যে ভাবে তোমরা আমাদের স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি ব্যবহারই পাইবে।

শনিবার ১৬ই মে সকালে আটটা বা নয়টার সময় আমি, আমার তিনটি সন্তান এবং আর একটি রমণী ছাড়া অবশিষ্ট সকলকেই লইয়া যাওয়া হইল এবং তাহাদের হত্যা করা হইল।

প্রশ্ন। আপনি কিরূপে জানিলেন যে তাহাদের সকলকে

হত্যা করা হইল এবং আপনাকেই বা তাহারা বাদ দিয়া গেল কেন ?

উত্তর। আমি এখানে আসিবার সময় সম্রাটের নামে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিয়াছিলাম এবং স্বহস্তে সেখানি তাঁহাকে দেওয়ার প্রার্থনা জানাই। তাহাতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি এবং আমার সন্তানগণ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছি এবং আমরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এই কারণেই আমাদের স্বতন্ত্র খাদ্য দেওয়া হইত এবং সম্রাটের ভৃত্যরাও জানিত আমরা মুসলমান। আমি কলমা পড়িতে পারিতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদেরও তাহা শিখাইয়াছিলাম। ১৬ই তারিখে একজন সেনানী আসিয়া বলে যে খ্রীশ্চানগণকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। যাহারা মুসলমান তাহাদের যাওয়া প্রয়োজন নাই। এই সব হতভাগিনীরা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাদের কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে, কিন্তু সিপাহীরা শপথ করিয়া বলিল যে তাহাদের অনুমান ভুল। তাহাদের অন্যত্র ভাল আবাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। পরে আমি শুনিয়াছি যে, উঠানে একটা পিপল গাছের নিচে তাহাদের লইয়া গিয়া প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। সম্রাটের খাস সেনাদল কর্তৃক এই কার্য সংঘটিত হয়। এই ঘটনার বিবরণ আমি এক ঝাড়ুদারের স্ত্রীর নিকট জানিয়াছি। হত্যাকাণ্ড সমাধা হইবার পরে দুই বার তোপধ্বনি দ্বারা আনন্দ-জ্ঞাপন করা হয়।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মুফতী সাহেব নামে এক বৃদ্ধ আসিয়া

আমাদের রক্ষী সৈন্যদের জানায় যে আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং আমাদিগকে কোনও নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হউক। তবে সে কার্য যেন রাত্রের অন্ধকারে করা হয়। কারণ দিনের আলোতে যদি কোনও বিদ্রোহী সৈন্য আমাদের দেখিতে পায় তাহা হইলে আমাদের রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

সন্ধ্যার সময় আমার দর্জির বাড়িতে আমাদের পুনরায় আনা হইল, কিন্তু পরবর্তী মঙ্গলবারে আমাদের আবার বন্দী করা হইল। এবার আমরা মির্জা মোগলের সম্মুখে বন্দীরূপে আনীত হইলাম। আমাদের কাপ্তেন ডগলাসের গৃহে রাখা হইল। হিন্দন যুদ্ধের পরদিন ৩৮ নং বাহিনীর দ্বারা আমরা মুক্ত হই। হিন্দু সিপাহীরা বলিতে লাগিল যে, তাহাদের জাতি নষ্ট করিবার কোনও চেষ্টাই ইংরাজ করে নাই, মিথ্যা ভয় দেখাইয়া তাহাদের এই বিদ্রোহে লিপ্ত করা হইয়াছে। তাহারা বলিল যে, ইংরাজ গভর্নমেণ্ট যদি তাহাদের ক্ষমা করেন, তাহা হইলে তাহারা আবার তাঁহাদের সেনাদলে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছে।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি দেশীয় পোশাক পরিয়া আমার তিনটি সন্তান এবং দুই জন ভৃত্যকে লইয়া দিল্লী হইতে মীরাটে আসি।

প্রশ্ন। বন্দী থাকাকালে আপনার কি এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ইউরোপীয় মহিলাদের দেশীয় সেনাবাহিনী অথবা দিল্লীর অধিবাসীগণ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার চোখেই দেখিয়াছিল?

উত্তর। হাঁ।

॥ মিঃ সি. বি. সণ্ডার্সের (C. B. Saunders) সাক্ষ্য ॥

[Officiating Commissioner and Agent to the Lieutenant Governor]

প্রশ্ন। দিল্লীর সম্রাট কি কারণে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রজা এবং পেনসনভোগী হইলেন, তাহার কারণ আপনার জানা থাকিলে এই বিচারসভায় বিবৃত করুন।

উত্তর। দিল্লীশ্বর শাহ আলম গুলাম কাদেরের হস্তে বহু নির্যাতন ভোগ করেন এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হয়। তারপর ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রদের হাতে বন্দী হন। কেবলমাত্র দিল্লী শহরের উপরে সম্রাটের নামমাত্র আধিপত্য থাকে, প্রকৃতভাবে তিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্দী-জীবন যাপন করেন। সেই সময় জেনারেল লেক আলিগড় জয় করিয়া ইংরাজ সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। দিল্লী হইতে ছয় মাইল দূরে পাটপনগঞ্জে মহারাষ্ট্র বাহিনীর সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যের যুদ্ধ জয় এবং তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দিল্লী শহর মহারাষ্ট্র বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সম্রাট শাহ আলম জেনারেল লেকের নিকট পত্র লিখিয়া ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ সৈনা দিল্লী প্রবেশ করে। সেই দিন হইতে দিল্লীর সম্রাট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পেনসনভোগী প্রজা বলিয়া গণ্য হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে যে বন্দীদশায় রাখিয়াছিল তাহা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া ব্রিটিশ শাসনের আশ্রয়ে

আসিলেন।

এই বন্দী ১৮৩৭ সালে দিল্লীর সম্রাট উপাধিলাভ করেন। তাঁহার প্রাসাদদুর্গের বাহিরে কোনও ক্ষমতা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নিজের ভৃত্য ও অনুচরবর্গকে উপাধি এবং সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতা অন্যত্র প্রকাশ করিতে তিনি পারেন না। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী—মাত্র তাঁহারাই কোম্পানির স্থানীয় আদালতের অধিকার হইতে মুক্ত, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতির অধীন।

প্রশ্ন। এই বন্দী কতগুলি অস্ত্রধারী সৈন্য রাখিতে পারেন—তাহার কি কোনও সীমা নির্ধারিত আছে?

উত্তর। এই বন্দী লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট আবেদন করেন যে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সৈন্য রাখিতে অনুমতি দেওয়া হউক। প্রত্যুত্তরে গভর্নর জেনারেল তাঁহাকে এই অনুমতি দেন যে, তাঁহার নির্ধারিত আয় হইতে যতগুলি সৈন্য রাখিতে সক্ষম, ততগুলি সৈন্য রাখিতে পারেন।

প্রশ্ন। বিদ্রোহের সময় গভর্নমেণ্ট হইতে কত টাকা পেনসন এই বন্দীকে দেওয়া হইত?

উত্তর। বাৎসরিক তিনি এক লক্ষ টাকা পেনসন পাইতেন। তাহার মধ্যে ৯৯০০০৲ টাকা দিল্লীতে দেওয়া হইত এবং অবশিষ্ট ১০০০৲ টাকা লক্ষ্ণৌতে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গকে দেওয়া হইত। দিল্লীর নিকট তাঁহাকে যে জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল তাহার

আয় বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া দিল্লী শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি বাড়ীভাড়া হিসাবেও অনেক টাকা পাইতেন।

অতঃপর বন্দী সম্রাট বাহাদুর শাহকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি এই সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক কি না?

তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

॥ বিচারের সিদ্ধান্ত ॥

এই বিচারসভার সম্মুখে যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের অভিমত এই যে, দিল্লীর প্রাক্তন রাজা—বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির প্রত্যেক অংশেই তিনি অপরাধী।

দিল্লী ৯ই মে ১৮৫৮ স্বাঃ M. Dawes, Lt. Colonel

President

„ F. J. Harriott, Major.

Deputy Judge. Advocate General.

Approved and Confirmed.

Sd.—N. Penny

সাহারন শিবির Major General Commanding

তারিখ ২রা এপ্রিল ১৮৫৮ Meerut Division

বিচারপর্ব শেষ হল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিশাল

সমাধিমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বন্দী হলেন কাপ্তেন হডসনের হাতে। হডসন তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁকে প্রাণে বধ করা হবে না। সুতরাং বিচারের রায়ে তিনি সর্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত হলেও তাঁকে দেওয়া হল নির্বাসন দণ্ড। দিল্লীর তক্ত-ই-তাউস ছেড়ে বৃদ্ধ সম্রাট চললেন সুদূর বর্মায় জীবনের শেষ দিনগুলি কাটানোর জন্য।

কিন্তু অপরাধী ছিল আরও অনেকগুলি। তাদের সকলের বিচার হয়েছিল কি না বলা যায় না। তবে সরকারী দপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আরও দুজনের বিচারের বিস্তারিত বিবরণ। একজনের নাম মোগল বেগ, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হাজী খাঁ।

মোগল বেগের বিচার হয় ১৮৬৮ সালে। এ ব্যক্তি ছিল সম্রাটের আরদালী। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকে হত্যা করা।

এ বিচারসভাতেও অনেক ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তরবারির আঘাতে উপরোক্ত ইংরাজ নরনারীর হত্যাসাধনের প্রমাণ গৃহীত হয়। অবশেষে পঞ্জাব গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী ডেভিস সাহেব ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের পত্রে জুডিসিয়াল কমিশনারকে জানান যে লেফটনাণ্ট গভর্নর সাহেব এই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করেছেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে দিল্লী প্রাসাদের সামনেই একে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

অপর ব্যক্তি হাজী খাঁকেও একই অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক বলা হয়েছে একে। বিদ্রোহের পরে একে গ্রেপ্তার করে স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফের কাছে হাজির করা হয়। তিনি তখনই নিজের তরবারি বার করে এর ভবলীলা সাঙ্গ করতে উদ্যত হলেন। আঘাত পেয়ে হাজী মাটিতে পড়ে যায়। মেটকাফ সাহেব মনে করেন তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হয় নি। মৃত্যু হল বিচারের পরে ফাঁসিকাঠে।

এই দুজনের বিচারের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট(ক)

॥ বিদ্রোহী মোগল বেগের বিচার ॥

বিচারসভা—দিল্লী।

তারিখ—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ—৩০শে জানুয়ারী, ৩১শে জানুয়ারী
এবং ১লা ফেব্রুয়ারী।

অভিযোগ—১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে নিম্নলিখিত ইউরোপীয় গণের হত্যা :—মিঃ সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন সি. আর. জি. ডগলাস, রেভারেণ্ড এম. জে. জেনিংস, মিঃ হাচিনসন, মিস জেনিংস, মিস ক্লিফোর্ড,

বিচারসভার ভূমিকায় প্রকাশ করা হয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধি বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (The Indian Penal Code does not apply.)

অভিযুক্ত বন্দী নিজেকে নির্দোষী বলিয়া প্রকাশ করে।

প্রথম সাক্ষী মহারাজ সিং ওরফে মোহনম্ সিং, পিতার নাম মথুরা দাস, বয়স ৩৫, পেশা চাকুরি, দিল্লী শহরের দিল্লী গেটের অধিবাসী যথারীতি শপথ গ্রহণ করিয়া ঘটনার বিবরণ বিচারসভায় প্রকাশ করে :—

১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে সকালে একজন চোপদার আসিয়া

কাপ্তেন ডগলাসকে জানায় যে, রাজপ্রাসাদের যে অংশে সম্রাটের বাসভবন, তাহারই নিচে কতকগুলি সোয়ার আসিয়া সমবেত হইয়াছে। আমি তখন কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করি। কাপ্তেন সাহেব এই কথা শুনিয়াই সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। আমি, মুসাহিব খাঁ নামে আর একজন চাপরাসী, এবং পুরন সিং জমাদার এই তিনজন তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কাপ্তেন ডগলাস এবং সম্রাট দুজনেই বারান্দায় গিয়া সেই সোয়ারদের সম্মুখীন হইলেন। সম্রাটের কয়েকজন দেহরক্ষীও সেখানে উপস্থিত ছিল। কাপ্তেন ডগলাস সোয়ারদের চলিয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। তিনি নিচে নামিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে নিচে নামিতে নিষেধ করিলেন। তিনি তারপর নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে আবার বাহিরে গেলেন। এবারে আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম না, এবং তাঁহার সঙ্গে অন্ত কেহ ছিল কি না তাহাও বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে পুরন সিং আমাকে এবং মুসাহিব খাঁকে ডাকিয়া বলিল, বাহিরে কি কাণ্ড হইতেছে শীঘ্র দেখিয়া যাও। বারান্দায় যাইয়া আমি দেখিলাম যে, মিস্টার ফ্রেজার তাঁহার বগীতে চড়িয়া প্রাসাদে ফিরিতেছেন এবং অনেকগুলি লোক কাপ্তেন ডগলাসকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। প্রাসাদের ক্যালকাটা গেটের নিকট একটা জলপ্রণালী আছে, কাপ্তেন সাহেব সেখানে লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা তিনজন এবং কিষণ

নামে আর একজন চাপরাসী তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া গেলাম। কাপ্তেন ডগলাসের মাথায় তখন আঘাত লাগিয়াছে এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন। আমরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। সেখানে দিল্লীর কালেক্টর মিস্টার জেনিংস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ড উপস্থিত ছিলেন। মিস জেনিংস খানিকটা তৈল লইয়া কাপ্তেন ডগলাসের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলেন। কাপ্তেন সাহের তখন অচৈতন্য হইয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই নিচে বহুলোকের কলরব শুনিতে পাওয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির নিচে মিস্টার ফ্রেজার রক্তাক্ত দেহে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর বাঁ দিকে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁর হাতের তরবারি ভগ্ন। সেই সময় দেখিলাম এই বন্দী (মোগল বেগ), বিলাউত্তী নামে আর একজন মোগল এবং হাজী নামে একজন সীলমোহর-খোদাইকর খোলা তরবারি লইয়া মিস্টার ফ্রেজারকে আক্রমণ করিয়াছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম যে এই বন্দী মোগল বেগ তরবারি দিয়া মিস্টার ফ্রেজারকে আঘাত করিল এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া মিস্টার জেনিংসকে এই সংবাদ জানাইলাম। জেনিংস সাহেবও ছুটিয়া গিয়া জানালার ভিতর দিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। অন্য সকলেও এই ভয়াবহ ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরমুহূর্তেই এই বন্দী, বিলাউত্তী মোগল এবং হাজী এবং আরও

কয়েক ব্যক্তি সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুসাহিব খাঁ তখন কাপ্তেন ডগলাস এবং দরজার মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার দেহের দুই জায়গায় তরবারির আঘাত পাইল। আমিও এই বন্দীর তরবারির বাঁটের একটা আঘাত আমার কপালে পাইলাম। সে আঘাতের চিহ্ন আজও আমার কপালে রহিয়াছে।

আমি এবং অন্যান্য চাপরাসীরা ঘরের বারান্দার দিকে ছুটিয়া গেলাম। ইতিমধ্যেই দেখিলাম যে এই বন্দী তাহার তরবারির দ্বারা কাপ্তেন ডগলাসকে আঘাত করিতেছে এবং তাহার সঙ্গীরাও নিজ নিজ তরবারি ব্যবহার করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা অন্য সিঁড়ি পথে নিচে নামিয়া আসিলাম। এই বন্দী মোগল বেগকে আমি খুবই জানিতাম। সে সম্রাটের খোজা মহবুবের আরদালীর কাজ করিত। বিলাউতী মোগলকেও আমি জানিতাম। সেও মহবুবের আরদালীর কাজ করিত। হাজী আমার পূর্বপরিচিত। লাহোর গেটের নিকট এক জায়গায় তাহার সীলমোহরের দোকান ছিল।

আমি প্রায় সাড়ে চারি বৎসর কাপ্তেন ডগলাসের চাপরাসীর কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

আদালতের প্রশ্ন। ইতিপূর্বে তুমি মিস্টার মারফির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে যে মিস্টার ফ্রেজার মৃত অবস্থায় সিঁড়ির নিচে পড়িয়া আছেন ইহাই তুমি দেখিয়াছ, এখন তোমার সাক্ষ্যে জানা যাইতেছে যে এই বন্দীই মিঃ ফ্রেজারকে আঘাত

করে। কোন্‌টা সত্য ?

উত্তর। আমি দেখিয়াছি এই বন্দী মিস্টার ফ্রেজারকে তরবারির আঘাত করিয়াছে।

প্রশ্ন। মহিলাদেরও হত্যা করা হইয়াছে—ইহাও কি তুমি দেখিয়াছ ?

উত্তর। না, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু নিচে নামিবার সময় বন্দী এবং তাহার সহকর্মীদের পৈশাচিক চীৎকার শুনিয়াছি।

দ্বিতীয় সাক্ষী—বখতাওর সিং, পিতার নাম মূল সিং, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়স ৪৬, বাসস্থান দিল্লী, পেশা চাকুরি, তাহার অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করে—

১১ই মে তারিখের সকাল প্রায় ন'টার সময় আমি আমার মনিব কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে তাঁহার বগীর পিছনে বসিয়া ক্যালকাটা গেটে যাই। আমি প্রাসাদরক্ষীর অধীনে প্রায় আঠারো বৎসর চাপরাসীর কাজ করিতেছি। সেখানে যাইয়া আরও কয়েকজনকে দেখিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ক্যালকাটা গেটের ভিতর দিয়া তিনজন সোয়ার এবং তাহাদের অনুবর্তী এক জনতা প্রবেশ করিল। তাহারা আসিয়াই বন্দুকের আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে কালেক্টর হাচিনসন সাহেব বাহুতে আঘাত পাইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। কাপ্তেন ডগলাস একটা নালার ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার

সঙ্গে আমি এবং কিষণ সিং লাফাইয়া পড়ি। কাপ্তেন ডগলাস ঐ নালা দিয়া লাহোর গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানে মহারাজ সিং এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। তখন বুঝিতে পারি যে ডগলাস সাহেবও আহত হইয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যখন তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আমি এবং লালমহম্মদ নামে এক মশালচী উভয়ে তাঁহাকে উপরে উঠিতে সাহায্য করি। তারপর আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিই। মিস্টার ফ্রেজার তখনও ফেরেন নাই। মিঃ জেনিংস আমাদের বলিলেন, একবার নিচে যাইয়া লাহোরী গেটের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান করা হোক। আমি, কিষণ সিং, পুরন সিং এবং মাখন—এই কয়জন নিচে নামিয়া আসিলাম। মুসাহেব খাঁ এবং মহারাজ সিং উপরেই রহিল। সেই সময় মিস্টার ফ্রেজার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপরে উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রাসাদের ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির নিচের ধাপে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই খোলা তরবারি লইয়া ছয় ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের পিছনে লাঠি ইত্যাদি লইয়া জনতা চীৎকার করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে এই বন্দী মোগল বেগ, সীলমোহর-খোদাইকর হাজী এবং মহম্মদ বখ্স্ বেগে অগ্রসর হইল এবং এই বন্দী তাহার হাতের তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবের মুখে আঘাত করিল। তিনি সিঁড়ির উপর

বসিয়া পড়িলেন। তখন এই বন্দীর সঙ্গীরাও তাঁহার উপর তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। তারপর তাহারা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সেই সময় আমি দেখিতে পাইলাম মিস্টার জেনিংস একটা জানালার অপর দিক হইতে আমাদের লক্ষ্য করিতেছেন। আমরা সেই সময় ভীত হইয়া ছুটিয়া পলাইলাম। এই বন্দীকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে মহবুব আলি খাঁর চাপরাসী। ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিয়া সে যখন উপরে উঠিতেছিল, তখন তাহার হাত, জামাকাপড় এবং তরবারি—সবই রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় সাক্ষীর বিবরণ—

নাম—কিষণ সিং, পিতার নাম রঘুনাথ সিং, বয়স ৩৮, পেশা চাকুরি, জাতি ব্রাহ্মণ, নিবাস দিল্লী শহর।

১১ই মে তারিখের সকালে আমি এবং মহারাজ সিং যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম।

পুলের দারোগা আমাদের জানাইল যে, একটা গোলমালের আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং আমাদের তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমরা প্রাসাদ-দুর্গের লাহোর গেটের দিকে ফিরিয়া আসিলাম। আমি কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করিতাম। ফটকের কাছে আমরা একজন সোয়ারকে দেখিতে পাইলাম, সে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল যে, সে মীরাটের ইউরোপীয়দের হত্যা করিয়া এখানে আসিয়াছে। আমি

ভিতরে যাইয়া কাপ্তেন ডগলাসকে এই কথা বলিলে তিনি বাহিরে আসিয়া সেই লোকটিকে প্রশ্ন করায় সে তাহার কথার পুনরুক্তি করিল। কাপ্তেন ডগলাস তখন গেটের সুবেদারকে আদেশ দিলেন, অবিলম্বে ঐ লোকটিকে যেন আটক করা হয়। এই আদেশ শুনিবামাত্র সে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সম্রাটের নিকট হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে সম্রাটের আহ্বান জানাইল। কাপ্তেন সাহেব সম্রাটের কাছে গেলে, আমি এবং আরও কয়েকজন চাপরাসী তাঁহার সঙ্গে গেলাম। বারান্দার অপর দিকে (নদীর দিকে) কয়েকজন সোয়ার তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। কাপ্তেন ডগলাস তাহাদের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সম্রাট তাঁহাকে নিষেধ করেন। কাপ্তেন সাহেব তখন বারান্দা হইতেই তাহাদের কিছু বলিলেন, তারপর তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল।

মুসাহিব খাঁ আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে বলিল, ফ্রেজার সাহেব তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চান। ডগলাস সাহেব তখনই দিলদার আলি খাঁর বগি লইয়া ক্যালকাটা গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি এবং অন্যান্য চাপরাসীরাও ছুটিয়া গেলাম। সেই সময় ছয় জন সোয়ার গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। মিস্টার হাচিনসন তাঁহার বাহুতে আঘাত পাইলেন। তাহারা কাপ্তেন ডগলাসকেও ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি একটি নালার মধ্যে লাফাইয়া

পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। লাফাইতে গিয়া ডগলাস সাহেব আঘাত পাইলেন। আমি তাহাকে কাঁধে করিয়া লাহোরী গেটে লইয়া গেলাম এবং সেখানে একখণ্ড পাথরের উপর তাঁহাকে বসাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই মিস্টার ফ্রেজার এবং হাচিনসন সেখানে আসিলেন। আমি এবং লালমহম্মদ কাপ্তেন ডগলাসকে এবং মাখন সিং, বখতাওয়ার সিং প্রভৃতি কয়েকজন হাচিনসন সাহেবকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলাম। তাঁহাদের শয্যায় শয়ান করানো হইল। মহিলারা তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

মিস্টার ফ্রেজার তখন একখানি তরবারি সংগ্রহ করিয়া নিচের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি গিয়াছিলাম। সিঁড়ির নিচে যাইয়া দেখি মিস্টার ফ্রেজারকে এই বন্দী এবং আরও কয়েকজন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং এই বন্দীই সর্বপ্রথম তাহার তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিল। তাহার সঙ্গীরাও ক্রমান্বয়ে ফ্রেজার সাহেবের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহাকে এইরূপে হত্যা করিয়া তাহারা উপরের দিকে ছুটিয়া গেল। আমরা ভীত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলাম। বন্দী মোগল বেগকে আমি ভালরূপে চিনি। হাজীও আমার পরিচিত। ফ্রেজার সাহেবকে তাহারাই প্রথমে আঘাত করে।

বেলা প্রায় দশটার সময় ফ্রেজার সাহেব নিহত হন। আমি যেখানে লুকাইয়া ছিলাম, সেখান হইতে সাড়ে দশটার সময়

দেখিতে পাইলাম যে কাপ্তেন ডগলাসের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইতেছে এবং এই বন্দী মোগল বেগ সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছে। হস্তীচালক আল্লাহি বকস এই বন্দীকে সেই সময় বলে যে সে নিজেও কতকগুলি জিনিস পাইয়াছে।

চতুর্থ সাক্ষীর বিবরণ—

নাম জাঠমল, পিতার নাম বুধ সিং, বয়স ৫২, পেশা চাকুরি, নিবাস দিল্লী শহর।

আমি রাজপ্রাসাদে সংবাদ সরবরাহের কাজ করিতাম এবং প্রতিদিন সকাল আটটা-নটার সময় আমার সংবাদ সকল কাপ্তেন ডগলাসের নিকট লইয়া যাইতাম। ১১ই মে সকালে আমি আমার বাড়ী হইতে রওনা হইয়াই জানিলাম যে কাপ্তেন ডগলাস ক্যালকাটা গেটের দিকে গিয়াছেন। আমিও সেখানে গেলাম এবং দেখিলাম যে কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার ফ্রেজার এবং আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে দশ-বারো জন সোয়ার শহরের ভিতর হইতে সেখানে আসিল। মিস্টার ফ্রেজার একজন নজীবের নিকট হইতে একটা বন্দুক লইয়া একজন সোয়ারকে নিহত করিলেন। তারপরে তিনি বগিতে চড়িয়া প্রাসাদদুর্গের লাহোর গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমিও সেইদিকে রওনা হইলাম এবং আধ ঘড়ি পরেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমি দেখিলাম ফ্রেজার সাহেব পায়চারি করিতেছেন। একটু পরেই দেখিলাম যে সেখানকার লোকেরা

তাঁহার প্রতি ধুলি নিক্ষেপ করিতেছে এবং হাততালি দিতেছে। তিনি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির মুখে যেমন তিনি পৌঁছিয়াছেন, হাজী খাঁ খোলা তরবারি হাতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। ফ্রেজার সাহেবও তাঁহার তরবারি দিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিলেন। ঠিক সেই সময় এই বন্দী মোগল বেগ, দীনমহম্মদ এবং একজন সিদ্দী একখানি গাড়ির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ফ্রেজার সাহেবকে আক্রমণ করিল। আমি দেখিলাম যে এই বন্দী মোগল বেগ তাহার তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবের ঘাড়ে আঘাত করিল। তিনি দেওয়াল ধরিয়া এক মুহূর্ত দাঁড়াইলেন—তার পরেই পড়িয়া গেলেন।

বন্দী মির্জা মোগলকে আমি ভালরূপেই চিনি। সে জোয়ান বখত এবং মেহবুব আলি খাঁর আরদালী ছিল। মিস্টার ফ্রেজারকে আঘাত করার পরে বন্দী এবং তাহার সঙ্গীরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

পঞ্চম সাক্ষীর বিবরণ—

নাম—উসরুফ খাঁ, পিতার নাম স্থুরমস্ত খাঁ, বয়স ৩৫, জাতি পাঠান, পেশা চাকুরি, নিবাস দিল্লী শহর।

আমি দিল্লী সম্রাটের অধীনে ছয় বৎসরকাল কাজ করিয়াছি। মিউটিনির তিন বৎসর পূর্বে আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ১১ই মে তারিখে আমি ছুটিতে ছিলাম। সেদিন নায়েব কোতোয়াল বলদেও সহায়ের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন,

প্রাসাদদুর্গে যাইয়া মিস্টার ফ্রেজারের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে। বেলা তখন প্রায় নটা। আমি লাহোরী গেটে যাইয়া দেখিলাম যে ফ্রেজার সাহেব পায়চারি করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। সেখানে তখন কোনও গোলমাল হয় নাই। কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই ফ্রেজার সাহেব ভিতরে গিয়াছিলেন। তিনি সিঁড়িতে সবে মাত্র পা দিয়াছেন, এমন সময় দেখিলাম যে এই বন্দী মোগল বেগ এবং খালিকদাদ ছুটিয়া গিয়া ফ্রেজার সাহেবকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিল। দু ঘড়ি পরে আমি তখন দেওয়ান-ই-খাসে, এই বন্দী একটা আটকোণা পিস্তল হাতে লইয়া আসিল এবং সকলকে তাহা দেখাইয়া বলিল যে উহা কাপ্তেন ডগলাসের। তারপর সে সকলকে বলিল যে, সে নিজে, দীন মহম্মদ, হাজী খাঁ এবং সিদ্দী সকলে মিলিয়া মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, পাদ্রী জেনিংস এবং দুটি মহিলাকে হত্যা করিয়াছে।

১৮৬০ সালে মিস্টার বারক্লে আমাকে এই বন্দী মোগল বেগের সন্ধান লইবার জন্য জয়পুরে পাঠান। বন্দী তখন পলাতক। আমি সংবাদ পাই যে সে তখন জয়পুরের মহারাজার সৈন্যবাহিনীতে কাপ্তেন গোলাম আলীর অধীনে কাজ করিতেছে। সেইখানেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই সাক্ষীর বক্তব্য শেষ হইলে বন্দী মোগল বেগ তাহাকে প্রশ্ন করে—জয়পুরে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হইত

কি না এবং তুমিই আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিতে কি না?

সাক্ষী তাহা স্বীকার করে নাই।

বিচারক মন্তব্য করেন—এই সাক্ষীর সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে পিস্তল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য।

ষষ্ঠ সাক্ষীর বিবরণ—

নাম—মাখন সিং, পিতার নাম পুরন সিং, জাতি আহির, বয়স ৩১, পেশা চাকুরি, নিবাস কানপুর।

আমি কাপ্তেন ডগলাস সাহেবের আরদালী ছিলাম। ১১ই মে তারিখের সকালে দুজন সোয়ার দিল্লী দুর্গের লাহোর গেটের নিকট উপস্থিত হয় এবং কাপ্তেন ডগলাস সাহেব সে সংবাদ পাইয়া তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। তাহারা চলিয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই সম্রাট তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। আমিও তাঁহার সঙ্গে প্রাসাদে যাই। প্রাসাদের অপর দিকে (নদীর দিকে) কতকগুলি বিদ্রোহী সেনানী একত্রিত হয় এবং কাপ্তেন ডগলাস তাহাদের সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। তার পর তিনি নিজের আবাসে ফিরিয়া আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, মিস্টার ফ্রেজারের নিকট হইতে কোনও চিঠি আসিয়াছে কি না। তাঁহাকে জানানো হয় যে মিস্টার ফ্রেজার ক্যালকাটা গেটের দিকে গিয়াছেন। ডগলাস সাহেব তখন স্থানীয় এক ব্যক্তির বগি চাহিয়া লইয়া তাহাতে চড়িয়া বাহিরে গেলেন।

আমি গাড়ির পশ্চাতে উঠিলাম। বখতাওর সিং গাড়ির পশ্চাতে উঠে নাই। ক্যালকাটা গেটের নিকট যাইয়া আমরা কয়েকজন ইংরাজকে দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই দরিয়াগঞ্জের দিক হইতে দুজন সোয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মিস্টার হাচিনসন সাহেবের বাহু লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। ফ্রেজার সাহেব তখন একজন শাস্ত্রীর নিকট হইতে একটি বন্দুক লইয়া একজন সোয়ারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। অপর ব্যক্তি পলায়ন করিল। জনতা তখন কাপ্তেন ডগলাসকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তিনি একটি নালার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। পড়িয়া যাওয়ায় তিনি শরীরে আঘাত পান। আমরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে এবং হাচিনসন সাহেবকে উপরে লইয়া যাই এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিই। কাপ্তেন ডগলাস আমাকে বলেন যে মেমসাহেবদের নিরাপদস্থানে লইয়া যাওয়ার জন্ম পালকির ব্যবস্থা করা হউক। আমি নিচে যাইয়া দেখি সেখানে তুমুল গোলমাল বাধিয়াছে। কাজেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম যে পালকির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, এই বন্দী মোগল বেগ, খালিকদাদ, দীনমহম্মদ এবং হাজী খাঁ তরবারি দিয়া ফ্রেজার সাহেবকে আঘাত করিতেছে এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। হাজী খাঁই প্রথমে তাঁহাকে আঘাত করে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়া জেনিংস সাহেবকে সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনিও একটা জানালা দিয়া সমস্ত দেখিলেন। আমি তখন

দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে বিদ্রোহীর দল সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলাম।

বিচারকের মন্তব্য—এই সাক্ষীর জবানবন্দী দেওয়ার ভঙ্গী বড়ই সন্দেহজনক। তাহার বক্তব্যের মধ্যে মিথ্যা থাকিলেও মোটামুটি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আরও দশ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া হয়। মোট ষোল জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয় এই বিচারসভায়। পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল নানা জায়গায়। যে কয়েকজনের এজাহার এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহার মধ্যেও পরস্পরবিরোধী উক্তি অনেক ছিল। অবশিষ্ট দশ ব্যক্তির মধ্যে নয়জনের এজাহার বর্জন করিয়া ষোড়শতম সাক্ষীর বক্তব্য লিখিত হইল।

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৬২।

ষোড়শতম সাক্ষীর বিবরণ—

নাম—দীদার বক্স, পিতার নাম ভাই খাঁ, বয়স ২১, জাতি বেলুচ, পেশা উষ্ট্রচালক, নিবাস তেলিওয়ারা দিল্লী।

এই বন্দী মোগল বেগের জন্য পরোয়ানা বাহির হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া আমি জয়পুরে কাপ্তেন গোলাম আলি খাঁকে তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে জানান যে, তাঁহার একজন আরদালীর নাম মোগল বেগ। এই কথা

শুনিয়া আমি পলিটিক্যাল এজেন্টকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখি। আমি বরোদায় যাই, সেখান হইতে আবার জয়পুরে ফিরিয়া আসি। তারপর কোটা শহরে যাইয়া খুসকা নামক এক ব্যক্তির কাছে খবর পাই যে, মোগল বেগ এবং গুলজার নামে আর এক ব্যক্তি হায়দরাবাদ (সিন্ধু) চলিয়া গিয়াছে। আমি সেখানে যাই এবং অবশেষে শিকারপুরে তাহাকে দেখিতে পাই। এই বন্দীকে মিউটিনির দু-তিন বৎসর পরে আমি জয়পুরে প্রথম দেখি। উসরুফ খাঁ যখন জয়পুরে আসে তখন তাহার নিকটেই আমি প্রথম জানিতে পারি যে মোগল বেগ একজন বিদ্রোহী এবং নরঘাতক।

॥ বন্দী মোগল বেগের বিবরণী ॥

আমার নাম মোগল বেগ, পিতার নাম মির্জা জান বেগ, বয়স ৩৫, জাতি মোগল, নিবাস ঝঝ্ঝর, পেশা চাকুরি। যখন মিউটিনি আরম্ভ হয়, আমি তখন দিল্লীর বাদশাহের অধীনে চাকুরি করিতাম। দু-দিন পরে আমি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া বাদশাহের সোয়ার-দলে কাপ্তেন হায়দার হোসেনের অধীনে যোগ দিই। দিল্লীর পতন পর্যন্ত আমি সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ১১ই মে ১৮৫৭ পর্যন্ত আমি জোয়ান বখতের আরদালীর কাজও করিতাম। সেই দিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত আমি আহম্মদ কুয়ারীর বাড়িতে ছিলাম। তারপর লালকুয়ায়

যাই, সেখান হইতে বেলা বারোটার সময় প্রাসাদদুর্গে যাই। লাহোর গেটে যে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা আমার পৌঁছিবার অনেক পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন জনতা কর্তৃক তাঁহাদের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইতেছিল। আমি লালকুয়া হইতে যখন প্রাসাদদুর্গে যাইতেছিলাম, তখনই কোতোয়ালীর নিকট দুজন ইংরাজকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। লালদিঘির নিকট একজন ইংরাজ পুরুষ ও একজন ইংরাজ মহিলাকেও মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বেলা বারোটার সময় জোয়ান বখত ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাসাদের দিকে যাইতেছিলেন, সেই সময় আমিও তাঁহার সঙ্গী হই। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন তখন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই জানেন আমি সেই সময় জোয়ান বখতের নিকট উপস্থিত হই। তাঁহাদের নাম—ছজ্জু সিং, ভোলা সিং, উসরাফ বেগ, করামত আলি, আসগর, মীর মহস্সুন, বেনারসী, হিমু, ফতে আলি, করম খাঁ।

মিউটিনির পরে দিল্লী হইতে যখন সমস্ত মুসলমানেরা বিতাড়িত হইল, সেই সময় আমিও দিল্লী ত্যাগ করিয়া জয়পুরে যাই এবং সেখানে কাপ্তেন মহুদ আলির অধীনে সিপাহীর কাজে ভর্তি হই। নয় মাস পূর্বেও আমি সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় আসরফ আলি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। সে এবং জীদার বকসের ভাই আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া আমাকে অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য বলে। আমি প্রথমে

তাহার কথায় স্বীকৃত হই নাই। তাহাদের বলি যে বিলাউতী মোগলের নামের সঙ্গে সম্ভবত ভুলক্রমে আমার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে আমি সেখান হইতে যোধপুরে চলিয়া যাই এবং সেখানে একটা চাকুরি পাই। এই সময়ে জাকোবাবাদ হইতে কয়েকজন সোয়ার সেখানে আসে এবং তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে শিকারপুরে গেলে ভাল চাকুরি পাওয়া যাইতে পারে। আমি দশ-বারো দিন পরে শিকারপুরে যাইয়া পৌঁছি। ছ মাস পরে দাঁদার বকস খয়েরপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি কোনও ইংরাজকেই কোনও সময় হত্যা করি নাই।

বিচারসভা এই সময় বন্দীকে জিজ্ঞাসা করেন, ছজ্জু সিং, উসরুফ বেগ, মীর মহম্মুন এবং বেনারসী ইহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাদের ঠিকানা, পিতার নাম প্রভৃতি তুমি বলিতে পার কি না?

বন্দী ঐ সব ব্যক্তির বিবরণ ঠিকানা প্রকাশ করিল।

তাহাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, তুমি মেহবুব আলি খাঁর আরদালীর কাজ করিতে?

উত্তর—তিনি জোয়ান বখতের সঙ্গে যখন থাকিতেন, সেই সময়ে আমি আরদালীরূপে উপস্থিত থাকিতাম।

প্রশ্ন—যে সব সাক্ষী মিস্টার ফ্রেজার এবং কাপ্তেন ডগলাসের হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছে, তাহারা কি মিথ্যা কথা বলিয়াছে?

যাই, সেখান হইতে বেলা বারোটার সময় প্রাসাদদুর্গে যাই। লাহোর গেটে যে ইউরোপীয়দের হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা আমার পৌঁছিবার অনেক পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন জনতা কর্তৃক তাঁহাদের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইতেছিল। আমি লালকুয়া হইতে যখন প্রাসাদদুর্গে যাইতেছিলাম, তখনই কোতোয়ালীর নিকট দুজন ইংরাজকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। লালদিঘির নিকট একজন ইংরাজ পুরুষ ও একজন ইংরাজ মহিলাকেও মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বেলা বারোটার সময় জোয়ান বখত ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাসাদের দিকে যাইতেছিলেন, সেই সময় আমিও তাঁহার সঙ্গী হই। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন তখন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই জানেন আমি সেই সময় জোয়ান বখতের নিকট উপস্থিত হই। তাঁহাদের নাম—ছজ্জু সিং, ভোলা সিং, উসরূফ বেগ, করামত আলি, আসগর, মীর মহম্মুন, বেনারসী, হিমু, ফতে আলি, করম খাঁ।

মিউটিনির পরে দিল্লী হইতে যখন সমস্ত মুসলমানেরা বিতাড়িত হইল, সেই সময় আমিও দিল্লী ত্যাগ করিয়া জয়পুরে যাই এবং সেখানে কাপ্তেন মহুদ আলির অধীনে সিপাহীর কাজে ভর্তি হই। নয় মাস পূর্বেও আমি সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় আসরফ আলি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। সে এবং দীদার বকসের ভাই আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া আমাকে অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য বলে। আমি প্রথমে

তাহার কথায় স্বীকৃত হই নাই। তাহাদের বলি যে বিলাউতী মোগলের নামের সঙ্গে সম্ভবত ভুলক্রমে আমার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে আমি সেখান হইতে যোধপুরে চলিয়া যাই এবং সেখানে একটা চাকুরি পাই। এই সময়ে জাকোবাবাদ হইতে কয়েকজন সোয়ার সেখানে আসে এবং তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে শিকারপুরে গেলে ভাল চাকুরি পাওয়া যাইতে পারে। আমি দশ-বারো দিন পরে শিকারপুরে যাইয়া পৌঁছি। ছু মাস পরে দাঁদার বকস খয়েরপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি কোনও ইংরাজকেই কোনও সময় হত্যা করি নাই।

বিচারসভা এই সময় বন্দীকে জিজ্ঞাসা করেন, ছজ্জু সিং, উসরুফ বেগ, মীর মহম্মুন এবং বেনারসী ইহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাদের ঠিকানা, পিতার নাম প্রভৃতি তুমি বলিতে পার কি না ?

বন্দী ঐ সব ব্যক্তির বিবরণ ঠিকানা প্রকাশ করিল।

তাহাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, তুমি মেহবুব আলি খাঁর আরদালীর কাজ করিতে ?

উত্তর—তিনি জোয়ান বখতের সঙ্গে যখন থাকিতেন, সেই সময়ে আমি আরদালীরূপে উপস্থিত থাকিতাম।

প্রশ্ন—যে সব সাক্ষী মিস্টার ফ্রেজার এবং কাপ্তেন ডগলাসের হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছে, তাহারা কি মিথ্যা কথা বলিয়াছে ?

উত্তর—তাহাদের সঙ্গে প্রায়ই নানাবিষয়ে আমার মতের অনৈক্য হইত, কাজেই তাহাদের কেহই আমার বন্ধু বা হিতৈষী নয়। তাহারা অনেক সময় বাদশাহের কাছে ইনামের জন্য আসিত এবং আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিতাম। আমীর আলি একজন গুপ্তচর এবং তাহার সমস্ত কথাই মিথ্যা। অন্যান্য সাক্ষীদেরও বক্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন—তুমি এবং খালিকদাদ বিলাউতী ছাড়া আর কোনও লোককে কি মোগল বলিয়া ডাকা হইত ?

উত্তর—আমাদের দুজনকেই মোগল বলিয়া ডাকা হইত। আমি মোগল বেগ নামে পরিচিত ছিলাম এবং বিলাউতীকে কেবল মোগল বলিয়া ডাকা হইত।

(বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, বন্দী যে সব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিয়াছে, তাহাদের এই বিচারসভায় হাজির করা হউক।)

১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৬২।

বিচারসভার কার্য আরম্ভ হইলে বন্দীর সাক্ষী হিমুর জবান-বন্দী গৃহীত হইল—

আমার নাম হিমু, পিতার নাম মাদার বকস, বয়স ২৫, জাতি শেখ মেরদা, বাসস্থান পূর্বে ছিল কেল্লায়, পেশা পূর্বে ছিল চাকুরি, বর্তমানে দরজি।

আমি জোয়ান বখতের পেয়াদা ছিলাম। মিউটিনি যেদিন

প্রথম আরম্ভ হয় সে দিন সকালে আমার কয়েকজন সাক্ষীর সঙ্গে জোয়ান বখতের বাসস্থান লালকুয়ায় যাই। এই বন্দী মোগল বেগও সেখানে উপস্থিত ছিল। জোয়ান বখত প্রাসাদে যাইবার সময় আমরা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। সেদিন জোয়ান বখত প্রাসাদে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই আমি চলিয়া আসিলাম। এই বন্দী কোথায় গেল তাহা আমি জানি না। সেদিন তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।

বন্দীর অপর সাক্ষী আসরফ আলির জবানবন্দী অতঃপর গৃহীত হইল :—

আমার নাম আসরফ আলি, পিতার নাম মীর মজহর আলি, বয়স ৩০, জাতি সৈয়দ, পেশা পূর্বে চাকুরি, বর্তমানে রুপার তার প্রস্তুতকারক, নিবাস ফরাসখানা, দিল্লী।

যখন মিউটিনি আরম্ভ হয়, তখন আমি বাদশাহের চাকরি করিতাম। জোয়ান বখতের লালকুয়ায় যে বাড়ি ছিল, তাহাতে প্রহরীর কাজ করিতাম। গোলমালের দিন এক বা দেড় ঘড়ির সময় আমি আমার নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলাম এবং বৈকালের পূর্বে ফিরিয়া আসি নাই। এই বন্দীকে সেদিন আমি দেখি নাই।

বিচারসভার প্রশ্ন—এই বন্দী যে সব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান?

উত্তর—ছজ্জু সিং জীবিত নাই। ভোলা সিং বাঁচিয়া আছে

কিন্তু বর্তমানে সে কোথায় থাকে তাহা আমি জানি না। দিল্লীতে সে এখন নাই। কেরামত আলি বাউয়ানীতে থাকে। উসরুফ বেগ নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি চিনি না। মীর মহম্মুন জীবিত নাই। বেনারসী এই শহরেই দরীবার নিকট থাকে। ফতে আলির মৃত্যু হইয়াছে। করম খাঁকে আমি জানি না।

(কমিশনারের মন্তব্য—বেনারসীকে হাজির করা হউক।)

বন্দীর আর একজন সাক্ষী ভোলার বিবরণী—

আমার নাম ভোলা, পিতার নাম হীরা, বয়স ৪০, জাতি আহির, পেশা চাকুরি, নিবাস দিল্লী শহর।

মিউটিনির সময় আমি বাদশাহের কর্মচারী ছিলাম। ঘটনার দিন সকালে আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম। দ্বিপ্রহরে (বেলা বারোটার সময়) আমি লালকুয়ায় জোয়ান বখতের বাড়িতে শান্ত্রীর কাজ করিতে যাই। আরও কয়েকজন আরদালী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। জোয়ান বখত বাড়িতেই ছিলেন এবং সেদিন তিনি বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। আমি সেখানে যাইয়া এই বন্দীকেও দেখিতে পাই। তাহার পোশাক সাধারণ অবস্থাতেই ছিল, কোথাও রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই।

বন্দীর সাক্ষী বেনারসীর জবানবন্দী—

আমার নাম বেনারসী, পিতার নাম বংশী, জাতি ব্রাহ্মণ,

বয়স ৩১, পেশা চাকুরি, নিবাস দিল্লী শহর।

আমি জোয়ান বখতের আরদালীর কাজ করিতাম। ঘটনার দিন সকাল নটার সময় লালকুয়ায় জোয়ান বখতের বাড়ির প্রহরীর কাজে ফতে আলীকে মুক্তি দিয়া আমি প্রহরী হই। বেলা বারোটার সময় আমাকে মুক্তি দিয়া ভোলা সিং প্রহরায় রত হয়। এই বন্দীকে সেই সময় অর্থাৎ বারোটার সময় সেখানে আমি দেখিতে পাই। তাহার পরিধানে সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল। তাহাতে কোনও রক্তের চিহ্ন ছিল না।

প্রশ্ন—এই বন্দী যে সব সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান?

উত্তর।—ছজ্জু সিং মৃত। উসরুফ বেগ নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি জানি না। কেরামত আলি বাওয়ানাতে আছে শুনিয়াছি। মীর মহসীন জীবিত নাই। ফতে আলিও মৃত। করম খাঁকে আমি জানি না।

প্রশ্ন।—মিউটিনির দিনের সকালে হিমু কিংবা আসগর আলিকে তুমি লালকুয়ায় দেখিয়াছ?

উত্তর।—হিমুকে দেখিয়াছি। আসগর আলিকে দেখি নাই।

বাহাদুর শাহের বিচার প্রসঙ্গে ৫রা ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮ তারিখে সংবাদ-সংগ্রাহক জাঠমলের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সেই সাক্ষ্যে লিখিত বিবরণী এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইল।

ঘটনার দিন আমি বাড়িতে বসিয়াই শুনিতে পাইলাম যে, মীরাট হইতে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া সেলিমপুর পুলের নিকট যে কুৎ ঘর (Toll house) আছে, তাহাতে আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করিয়াছে এবং টোপ কালেক্টরকে হত্যা করিয়াছে। আমি প্রথমে এ সংবাদ বিশ্বাস করি নাই এবং আমার প্রতিদিনের দিনলিপি যথারীতি লিখিয়া গেলাম। লেখার কার্য শেষ করিয়া আমি রাজপ্রাসাদে আসিয়া জানিলাম যে, কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার ফ্রেজার, মিস্টার হাচিনসন এবং কমিশনার আফিসের হেডক্লার্ক মিস্টার নিকলসন সকলেই এই বিদ্রোহীদের দমনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ক্যালকাটা গেটের দিকে গিয়াছেন। আমিও তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলাম। এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে একদল বিদ্রোহী জিনৎ-উল-মসজিদের ফটক দিয়া শহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দরিয়াগঞ্জে কয়েকটি বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে। সেখান হইতে আমরা ধুম দেখিতে পাইলাম। বেলা তখন প্রায় আটটা। সেই সময়ে দেখা গেল তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক কয়েকজন ইউরোপীয়কে তাড়া করিয়া আসিতেছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে একজন তাঁহার পিস্তল ছুঁড়িলেন, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। তিনি তখন বারুদখানার দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। সেই সময় ফ্রেজার সাহেব এক সিপাহীর বন্দুক লইয়া বিদ্রোহীদের লক্ষ্য

করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। একজন তাহাতে নিহত হইল। অপর বিদ্রোহীরা তখন তাহাদের নিহত সঙ্গীর ঘোড়াটিকে বন্দুকের গুলিতে বধ করিল।

ফ্রেজার সাহেব তখন বগীতে উঠিলেন এবং কাপ্তেন ডগলাস এবং মিস্টার হাচিনসন পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিয়া প্রাসাদ-দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তাহার পিস্তলের গুলিতে মিস্টার হাচিনসনের বাহুতে আঘাত করিল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন বিদ্রোহী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন ফ্রেজার সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল, কিন্তু তাহা ফ্রেজারের গায়ে লাগিল না। এই সময়ে কাপ্তেন ডগলাসের এক চাপরাসী, নাম বখতাওর সিং, ফ্রেজার সাহেবের বগীর পিছনে বসিয়া ছিল। কাপ্তেন ডগলাস এই সময়ে দুর্গ-প্রাচীরের নিচে যে জল-প্রণালী আছে তাহাতে লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু কতক-গুলি পাথরের উপর পড়ায় তিনি আঘাত পাইলেন। বিদ্রোহীরা তখন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। সেই সুযোগে বখতাওর সিং এবং আরও কয়েকজন মিলিয়া কাপ্তেন ডগলাসকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। ডগলাস সাহেব অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিস্টার হাচিনসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকেও উপরে আনিবার জন্য বলিলেন। ফ্রেজার সাহেব তখনও নিচে ছিলেন। তিনি পায়চারি করিতে করিতে পুনর

নামে এক আরদালীকে বলিলেন, সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার জন্য দুইটি বন্দুক আনা হউক। ইতিমধ্যে এক জনতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ফ্রেজারকে লক্ষ্য করিয়া হাততালি দিয়া অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তিনি তখন কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক এই সময় হাজী নামে এক কারিগর খোলা তরবারি লইয়া ফ্রেজার সাহেবকে আক্রমণ করিতে আসিল। ফ্রেজারেরও কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি ছিল, তিনি নিজের তরবারি লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে যে শান্ত্রী ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ কি ব্যবহার? শান্ত্রী তখন বিদ্রোহীদলকে হঠাইয়া দিবার চেষ্টা (অথবা ভান?) করিল। ফ্রেজার সাহেব পুনরায় সিঁড়ির দিকে যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় হাজী আবার ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলার ডান দিকে সজোরে আঘাত করিল। ফ্রেজার সাহেব পড়িয়া গেলেন। ঠিক সেই সময় খালিকদাদ নামে এক কাবুলী পাঠান, মোগল বেগ বা মোগল জান এবং শেখ দীন মহম্মদ—এই তিন ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া ভূপতিত মিস্টার ফ্রেজারের সর্বাঙ্গে নির্মমভাবে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। শেখ দীন মহম্মদ সম্রাটের একজন সৈনিক, খালিকদাদ এবং মোগল বেগও সম্রাটের মন্ত্রী মাহবুব আলি খাঁর প্রহরী।

ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিয়া এই দল সিঁড়ি দিয়া

উপরের দিকে অগ্রসর হইল। মাখন নামে কাপ্তেন ডগলাসের এক ভৃত্য তাঁহাদের এই আসন্ন বিপদের কথা জানাইলে তাঁহারা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী দল দরজা ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে ঢুকিয়া কাপ্তেন ডগলাস, মিস্টার হাচিনসন, পাদ্রী মিস্টার জেনিংস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকেও নির্মমভাবে হত্যা করিল। কলিকাতা হইতে সেদিন সকালে আর একজন ইংরাজ ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তিনি পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিঁড়ির নিচে তাঁহাকেও হত্যা করা হইল। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড শেষ করিতে পনেরো মিনিটও সময় লাগে নাই। আমি এই সব ঘটনা বিস্তৃতভাবে মাখন, পুরন, বখতাওর প্রভৃতির নিকট শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সব হত্যাকাণ্ডের আমিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

॥ বিচারসভার সিদ্ধান্ত ॥

দিল্লীর প্রাসাদদুর্গের লাহোরী গেটের দ্বিতলের আবাসস্থলে এবং তাহার নিকটে যে সব ইউরোপীয়গণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে, বর্তমানে সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কর্মচারীদের তালিকা হইতে সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, ধর্মযাজক মিস্টার জেনিংস এবং মিস্টার হাচিনসনের

নাম অবলুপ্ত করিয়াছেন।

ইহাদের মৃত্যুর কারণ কি সে সম্বন্ধে ডাক্তারী অভিমত আজ পাওয়া যাইবে না এবং তাহার কোনও প্রয়োজনও নাই। এই সকল ব্যক্তিগণকে যেরূপ পৈশাচিক ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন সাক্ষীরা এই সব অমানুষিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। বুলন নামে একজন স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের রক্তাক্ত মৃত-দেহের পাশে উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া এই বন্দী এবং তার দুই সহকর্মী দাঁড়াইয়া আছে।

এই বন্দী মোগল বেগ হত্যাকারীদের দলে ছিল এবং তাহার নিজের হাতে ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করে। তাহার এই নৃশংস কার্যের প্রমাণ স্বরূপ যে সকল জবানবন্দী পাওয়া গিয়াছে সেগুলি দেখিলে যে কোনও বিচারক তাহাকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিবে।

সাক্ষীদিগের সম্বন্ধে আমার মন্তব্য এই যে, প্রথমতঃ তাহারা সকলেই কাপ্তেন ডগলাসের আরদালী-চাপরাসী। কেবল চার নং সাক্ষী (জাঠমল) প্রাসাদে সংবাদ-সরবরাহকারীর কার্য করিয়া থাকে এবং কাপ্তেন ডগলাসের নিকট সে প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকে। পাঁচ নং সাক্ষী (উসরূফ খাঁ), তাহার জবানবন্দীর উপর আমি বেশী আস্থা স্থাপন করি না। বন্দীকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য সে গুপ্তচরের কাজ করিত। সে এক দিকে বন্দীর আবাসস্থানের সন্ধান দিয়াছে, অন্য দিকে বন্দীকে অন্যত্র

পলায়নের পরামর্শ দিয়াছে।

সাক্ষীদের মধ্যে পাঁচজনের উপর আমি বিশেষরূপ আস্থা স্থাপন করি। তাহারা বুদ্ধিমান এবং যাহা নিজের চোখে দেখিয়াছে তাহাই এই বিচারসভায় বিবৃত করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—বিভিন্ন সাক্ষীর উক্তির মধ্যে যে সব অনৈক্য রহিয়াছে তাহা এমন কিছু গুরুতর নয় যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে সে সব বিবরণ মিথ্যা। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে পারি যে সাক্ষী বখতাওর সিং বলিয়াছে যে, দ্বিতলে যেখানে ডগলাস এবং হাচিনসন সাহেব শায়িত ছিলেন, সেখানে মহারাজ সিং উপস্থিত ছিল এবং সেই সময়ে বিদ্রোহীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সাক্ষীরা যাহা বলিয়াছে তাহার মধ্যে কিছু গরমিল আছে বটে, কিন্তু তাহাতে মূল ঘটনার কোনও ওলটপালট হয় না। একজন সাক্ষী বলিয়াছে যে, বখতাওর সিং কাপ্তেন ডগলাসের বগীর পিছনে উঠিয়াছিল, আর একজন বলিয়াছে যে, বগীর পিছনে ছিল মাখন, বখতাওর নয়। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার প্রসঙ্গে যে সব সাক্ষীদের জবানবন্দী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ফ্রেজার সাহেবের গাড়ির পিছনে ছিল বখতাওর এবং কাপ্তেন ডগলাসের গাড়ির পিছনে ছিল মাখন। ঘটনাটা ঘটিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্বে, সুতরাং এই সব খুঁটিনাটি ভুলিয়া যাওয়া এই সব সাক্ষীদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

তৃতীয়তঃ—সংবাদ সরবরাহকারী জাঠমল যাহা বলিয়াছে

তাহা অন্যান্য সাক্ষীদের উক্তির সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। সে বলিয়াছে যে, মিস্টার ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডের নায়ক এই বন্দী, হাজী খাঁ, খালিকদাদ নামে এক কাবুলী পাঠান এবং শেখ দীন মহম্মদ। সে বলিয়াছে যে সে এসব বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছে মাখন, বখতাওর, পুরন ও কিষণের নিকট হইতে। চার বৎসর পূর্বে বাহাদুর শাহের বিচারের সময় সে যাহা বলিয়াছিল, তাহার বর্তমান উক্তির সঙ্গে সেগুলি হুবহু মিলিয়া যায়।

চতুর্থতঃ—কয়েকজন সাক্ষীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, এই বন্দী ঐ সব হত্যাকাণ্ডের পরে উল্লসিত অবস্থায় নিচে নামিয়া আসিতেছে। সে সব বর্ণনাগুলির মধ্যে পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে।

পঞ্চমতঃ—যাহারা সাক্ষ্য দিতেছে তাহাদের সকলের কাছেই এই বন্দী সুপরিচিত। বাহাদুর শাহের পুত্র জোয়ান বখতের আরদালীর কাজ করিত এই বন্দী। তাহা ছাড়া বাদশাহের মন্ত্রী মাহবুব আলি খাঁর আরদালীর কাজও এই ব্যক্তি করিয়াছে। চাঁদনি চক হইতে বাদশাহের অন্তঃপুরে যে রাস্তা গিয়াছে, উহা লাহোরী গেটের দ্বিতলে কাপ্তেন ডগলাস ও জেনিংস সাহেবের বাসগৃহের নিকটবর্তী, একথা বন্দী জানিত। সে উহা স্বীকারও করিয়াছে।

বন্দী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে বেলা বারোটার পূর্বে সে প্রাসাদদুর্গে আসে নাই এবং ঐ সকল হত্যাকাণ্ড এই সময়ের অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়। সে আরও বলিয়াছে যে, "মোগল"

শব্দটিতেই ভুল করিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। খালিকদাদই মোগল নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাক্ষীদের জবানবন্দীতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। সাক্ষীদের নিকট হইতে যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বন্দী যে নির্দোষ একথা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

সুতরাং আমি মিস্টার সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের হত্যার অপরাধে এই বন্দী মোগল বেগকে সম্পূর্ণভাবে দোষী বিবেচনা করিতেছি এবং আদেশ দিতেছি যে ফাঁসি দ্বারা তাহার মৃত্যু ঘটানো হউক। আমি আরও অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে দুর্গপ্রাসাদের লাহোরী গেটের সম্মুখে চাঁদনি চকের দিকে যে খোলা জায়গা আছে, সেইখানেই প্রকাশ্যভাবে ইহার ফাঁসি দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে অবশ্য সেনাবিভাগের অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

জুডিসিয়াল কমিশনার মহোদয়ের আদেশের জন্য বিচারের এই সব নথিপত্র পাঠানো হইল। ইতি—১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২।

॥ পঞ্জাবের জুডিসিয়াল কমিশনারের সিদ্ধান্ত ॥

Crown vs Moghul Beg

অভিযোগ—মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের হত্যা।

বিচারালয়ের সমস্ত কার্য ইংরাজী ভাষাতেই করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি বিধান (Indian penal code) এক্ষেত্রে প্রয়োগ

করা হয় নাই, কারণ যে অপরাধের জন্য এই বিচার তাহা ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হইয়াছে। পুরাতন প্রথাতেই বিচারকার্য সম্পন্ন হয়।

এই বিচারে কোনও ডাক্তারী প্রমাণ নাই। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে দিল্লী শহরে ফ্রেজার সাহেব, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ড অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন।

নিহত মিস্টার ফ্রেজার ছিলেন দিল্লীর কমিশনার। কাপ্তেন ডগলাস রাজসৈন্যের অধিনায়ক এবং মিস জেনিংস ও মিস ক্লিফোর্ড দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় ইঁহাদের অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। বিচারসভায় যে সব প্রমাণাদি গৃহীত হইয়াছে, এখন তাহার পুনরালোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেকটি সাক্ষী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বিবরণ দিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৃত্তির প্রাত্যহিক প্রয়োজনেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। পরস্পরের বিবরণীর মধ্যে যে সব সামান্য অনৈক্য দেখা গিয়াছে, তাহাতে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষীদের পরস্পরের মধ্যে কোনও যোগসাজস ছিল না। অথচ এই সব অনৈক্য দ্বারা মূল সত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই।

ঘটনার পরে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের মনে যে উত্তেজনার প্রাধান্য ছিল, তাহা এখন স্তিমিত। ১৮৫৮ সালে বাদশাহের বিচারের জন্য যে সভা

আহূত হইয়াছিল, সেখানেও বহু সাক্ষী দ্বারা এই বন্দীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সে পলাতক ছিল, অবশেষে ১৮৬২ সালে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বিচার ব্যাপারে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, সকলেই তাহার পরিচিত এবং অনেকেই স্বচক্ষে তাহাকে এই নৃশংস কার্য করিতে দেখিয়াছে। ফ্রেজার সাহেব এবং ডগলাস সাহেবকে এই ব্যক্তি তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়াছে এবং মিস ক্লিফোর্ড ও মিস জেনিংসকেও হত্যা করিয়া, তাঁহাদের মৃতদেহের পাশে রক্তাক্ত তরবারি লইয়া আস্ফালন করাও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে। বন্দী বলিয়াছে, সাক্ষীদের সঙ্গে তাহার শত্রুতা ছিল, কিন্তু তাহা সে প্রমাণ করিতে পারে নাই। কমিশনার সাহেব তাহাকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

কমিশনার সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ইহার ফাঁসি দেওয়া হউক এবং সে কার্য প্রাসাদদুর্গের সম্মুখেই সংঘটিত হউক। আমি এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছি না। এই সকল কাগজপত্র মহামান্য লেফটনাণ্ট গভর্নরের অনুমোদনের জন্য পাঠাইতেছি।

আমি প্রস্তাব করি যে, এই বিচারের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হোক।

(স্বাঃ) Robert Cust
Judicial Commissioner

আর এইচ ডেভিস (পঞ্জাব গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী) মহোদয়ের নিকট হইতে আর এন কাস্ট—জুডিসিয়াল কমিশনারকে লিখিত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের ১৪১ নং পত্র—

মিস্টার সাইমন ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত মোগল বেগের বিচারে ফাঁসির আদেশ সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র আপনি ২০শে তারিখে ৯৯ নং পত্রের সহিত পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তরে আমি আপনাকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে হত্যাকারী বেশ শাস্তি এবং পক্ষপাতহীন বিচারের সুযোগ পাইয়াছে। এই বিচারসংক্রান্ত নথিপত্র ভালরূপ আলোচনা করিয়া মহামান্য লেফটনাণ্ট গভর্নর সাহেব আপনার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, বন্দীর প্রতি যে চরম দণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাহার একমাত্র প্রাপ্য। তিনি আপনার অপর প্রস্তাব অর্থাৎ দিল্লী দুর্গের সম্মুখের খোলা জায়গায় মিলিটারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া এই ব্যক্তির ফাঁসি দেওয়া হোক—তাহাতেও সম্পূর্ণভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিবরণী প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হউক, ইহাও তিনি সমর্থন করেন।

আপনার নিকট প্রাপ্ত মূল নথিপত্র এই সঙ্গে ফেরত পাঠানো হইল।

পরিশিষ্ট (খ)

॥ হাজী মিঞার বিচার ॥

১০ই ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখে (সিপাহী বিদ্রোহের এগারো বৎসর পরে) তিনজন এসেসরকে লইয়া একটি বিশেষ দায়রা আদালতে হাজী মিঞার বিচার হয়।

অভিযোগ—মিস্টার সাইমন ফ্রেজার, মিস্টার হাচিনসন, রেভারেণ্ড জে এম জেনিংস, মিস জেনিংস, কাপ্তেন ডগলাস, মিস ক্লিফোর্ড এবং আরও এক ব্যক্তিকে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখের সকালে দিল্লী দুর্গের সান্নিধ্যে হত্যা করা।

প্রযোজ্য আইন—১৭৯৯ সালের ৮নং রেগুলেশন।

আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করে।

সাক্ষী মহারাজ সিংয়ের বিবরণ—

আমার নাম মহারাজ সিং। মহনাম সিং বলিয়াও কেহ কেহ সম্বোধন করে। দিল্লীতে যখন বিদ্রোহ হয় আমি তখন কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করি। এই বন্দীকে আমি বিলক্ষণ চিনি। উহার নাম হাজী। সীলমোহর খোদাই করা উহার পেশা। দিল্লী দুর্গের লাহোরী গেটের কাছে যে খিলানওয়ালা পথ আছে, সেইখানে উহার দোকান। ঐ

স্থানেরই উপরতলায় কাপ্তেন ডগলাস থাকিতেন। ঘটনার দিন সকালে কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার বগীতে চড়িয়া ক্যালকাটা গেটের নিকট যান। বেলা তখন প্রায় আটটা। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখিলাম তিনি পদব্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন। তারপর দেখা গেল তিনি থানার ভিতর পড়িয়া গেলেন। কিষণ সিং এবং অন্যান্য চাপরাসীরা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। আমিও তাহাদের সাহায্য করিলাম। দেখা গেল, তিনি খুব উত্তেজিত হইয়াছেন এবং পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়াছেন। আমি, কিষণ সিং, পুরন জমাদার, মুসাহিব খাঁ, মাখন, বখতাওর সিং চাপরাসী সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। সেখানে পাদ্রী সাহেব এবং তাঁহার কন্যা ডগলাস সাহেবের কপাল এবং চিবুকের যে সব জায়গায় আঘাত লাগিয়াছিল, সেখানে তেল মালিশ করিতে লাগিলেন। এই বন্দীকে সে সময় আমি দেখিতে পাই নাই। কাপ্তেন সাহেব আমাদের সকলকে নিচে যাইতে বলিলেন। সকলেই নিচে নামিয়া গেল, কেবল আমি, মুসাহিব খাঁ, মাখন এবং পুরন এই চারি জন ঘরের বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঠিক সেই সময়ে নিচে একটা গোলমাল শোনা গেল এবং কি ব্যাপার জানিবার জন্য আমরা নিচে চলিয়া আসিলাম। একটা ঝরোকার ভিতর দিয়া আমরা দেখিলাম যে, সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে মিস্টার ফ্রেজারের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। অনেক লোক তখন সেখানে জমায়েৎ হইয়াছে।

তাহাদের মধ্যে তিনজন—এই বন্দী হাজী মিঞা, মোগল বেগ এবং আল্লাদাদ মোগল খোলা তরবারি লইয়া আস্ফালন করিতেছে এবং প্রত্যেকেই বলিতেছে আমিই উহাকে মারিয়াছি।

পুরন জমাদার তাহাদের সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক তখন সরিয়া গিয়া ফিলী খানা—যেখানে বাদশাহের হাতী থাকিত, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। এই সময় দ্বিতল হইতে চীৎকার শুনিয়া আমরা ছুটিয়া সেখানে গেলাম। আমরা যাইয়া দেখিলাম যে কয়েকজন ইতিমধ্যে কাপ্তেন ডগলাসের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একজন পুরনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, আর একজন মুসাহিব খাঁকে তলোয়ার দিয়া আঘাত করিল। আমরা দেখিলাম ইতিমধ্যেই কাপ্তেন ডগলাস, পাদ্রী সাহেব, দুইজন মেম সাহেব এবং আরও দুইজন নবাগত সাহেব—সকলেই নিহত হইয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিলাম। সেই গোলযোগের মধ্যে আমি তখনও কাহাকেও চিনিতে পারি নাই, তার পর দেখিলাম এই বন্দী এবং আরও কয়েকজন রক্তমাখা তলোয়ার লইয়া আসিতেছে। আমি সেখান হইতে আমার নিজের ঘরের দিকে ছুটিয়া পলাইলাম। যে তিনজনের নাম আমি বলিয়াছি, তাহারা প্রত্যেকেই আমার পরিচিত বলিয়া সেই জনতার মধ্যেও আমি তাহাদের চিনিতে পারিয়াছিলাম।

বখতাওর সিংয়ের সাক্ষ্য—

দিল্লীতে যেদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে, সেদিন আমি বেলা সাড়ে আটটার সময় কাপ্তেন ডগলাসের সঙ্গে শহরের নিগমবোধ গেটে যাই। সেখানে আরও কয়েকজন ইংরাজ ভদ্রলোক তখন দূরবীন দিয়া কিছু দেখিতেছিলেন। সেই সময় দু জন সোয়ার আসিয়া একজন সাহেবকে আক্রমণ করিল এবং তিনি আহত হইয়া তাঁহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া অন্যান্য সকলে এদিক ওদিকে চলিয়া গেলেন, কাপ্তেন ডগলাসও পদব্রজে প্রাসাদদুর্গের দিকে ফিরিলেন। তার পর দেখিলাম ডগলাস সাহেব একটা নালার ভিতর পড়িয়া গেলেন, কিষণ সিংও তাঁহার অনুসরণ করিল। তার পর সাহেবকে লইয়া সকলে তাঁহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ফ্রেজার সাহেব সেখানে সেই সময় উপস্থিত হইয়া কাপ্তেন ডগলাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি দ্বিতলে যাইবেন কিনা। তিনি সম্মতি জানাইলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত আরদালী চাপরাসীরা সেখানে আসিয়া সমবেত হইল। ফ্রেজার সাহেব বলিলেন, কাপ্তেন ডগলাসকে কিলী খানায় লইয়া যাইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া রাখা হউক। আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে প্রথমে সেখানে, তার পর দ্বিতলে লইয়া গেলাম। ফ্রেজার সাহেব এবং আরও তিনজন আমাদের সঙ্গে গেলেন। দ্বিতলের ঘরে তখন পাদ্রী সাহেব, তাঁহার কন্যা এবং আরও একজন নবাগত ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন।

কাপ্তেন ডগলাস আমাদের নিচে নামিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা নামিয়া আসিলাম, কেবল মাখন, মুসাহিব এবং মহারাজ তাঁহার নিকট রহিল। সেই সময় অন্য সিঁড়ি দিয়া ফ্রেজার সাহেব সেখানে আসিলেন। তিনি সিঁড়ির নিচে নামিয়াছেন, এমন সময়ে কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে এই বন্দী, মোগল বেগ, আল্লাদাদ, মহম্মদ বখ্স্, মছলি-ওয়ালা এবং লম্বা দাড়িওয়ালা আর এক ব্যক্তি ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির নাম আমি জানি না, তবে জানিয়াছি তাহারও ফাঁসি হইয়াছে।

(এইখানে বিচারক মন্তব্য করেন—এই ব্যক্তির নাম সম্ভবতঃ নবী বক্স্। ১৮৫৯ সালে অন্য কয়েকজন খ্রীশ্চান বন্দীর হত্যাপরাধে তাহার ফাঁসি হয়।)

তাহারা ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিল। আমরা সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহারা কিলী খানার দিকে চলিয়া গেল। তার পর কি হইল আমার জানা নাই, কারণ আমি আর দ্বিতলে যাই নাই। তবে কিছুক্ষণ পরে সেই লোকগুলি রক্তাক্ত তরবারি হাতে 'দীন' 'দীন' চীৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। যাহাদের নাম আমি উল্লেখ করিলাম, তাহাদের সকলকেই আমি ভালরূপে চিনি। এই বন্দী সীলমোহর খোদাই করিত। এই ঘটনার সময় তাহার পরিধানে ছিল একটি কুরতা এবং তেহমল।

দিল্লী শহর অধিকার করিবার পরে একদিন জাঠমল নামে

এক আখবরনবিস আমাকে এবং মাখনকে সঙ্গে লইয়া আরব সরাইতে যায় এবং বলে যে সীলমোহর খোদাইকর হাজী মিয়াকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম সে পাইয়াছে এবং সেখানে তাহার সন্ধান পাইয়া আমাদের লইয়া আসিয়াছে। এই বন্দীকে যখন গ্রেপ্তার করা হইল, আমি এবং মাখন দুজনে আসিয়া মেটকাফ সাহেবকে সেই সংবাদ জানাই। সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মাখন আরব সরাইতে ফিরিয়া যায়। আমি সে সময় আর যাই নাই। জাঠমলের মৃত্যু হইয়াছে এবং মাখনের মৃত্যুর খবরও আমি সম্প্রতি শুনিয়াছি।

কিষণ সিংয়ের সাক্ষ্য—

আমি বর্তমানে দিল্লী পুলিশের একজন সার্জেণ্ট। মিউটিনির সময় আমি কাপ্তেন ডগলাসের আরদালীর কাজ করিতাম। যেদিন তিনি নিহত হন, সেদিন সারা সকাল আমি তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়াছি। নিগমবোধ গেটে এবং সেখান হইতে প্রাসাদদুর্গে, তার পর লাহোর গেট এবং কিলী থানায় এবং সব শেষে বিশ্রামকক্ষে আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। সেই সময় সম্রাটের চিকিৎসক আসানউল্লা খাঁ আসিয়া কাপ্তেন ডগলাসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন যে ক্যালকাটা গেটের মারামারির সংবাদ সম্রাটের কানে পৌঁছিয়াছে এবং চারিদিকেই গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। আসানউল্লা খাঁ বলিলেন যে, মেমসাহেবদের জন্য দুখানি পালকি এবং গুলিবারুদসহ একজন

রক্ষীকে অবিলম্বে পাঠানো হইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখা গেল যে সেসব কিছুই আসিল না, তখন ফ্রেজার সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিজে চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। গোকুল চাপরাসী নামে একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির তলোয়ারখানি ফ্রেজার সাহেব লইলেন। আমার হাত হইতে আমার ছাতাটি লইয়া আমাকে ডগলাস সাহেবের নিকট ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আমি সিঁড়ি দিয়া কয়েক ধাপ উঠিয়াছি এমন সময় দেখিলাম যে ফ্রেজার সাহেব নিহত হইলেন। এই বন্দী হাজী মিয়া, মোগল বেগ, আলাকদাদ খাঁ এবং ওয়াজীব আলি—ইহারাই ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিয়াছে। তা ছাড়া আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। হত্যাকারীরা তার পর কিলী খানার দিকে চলিয়া গেল। তার পরে যে সব হত্যাকাণ্ড হইয়াছে তাহা আমি দেখি নাই। এক ঘড়ি পরে আমি মাখন আরদালীর বাড়িতে গেলাম। সেখানে তখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত লুট করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহারা বলিল, পুরন জমাদার (মাখনের পিতা) কাপ্তেন ডগলাসকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমি বলিলাম, কাপ্তেন সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তিনি নিহত অবস্থায় উপরে রহিয়াছেন। আমরা তখন দ্বিতলে গেলাম। মামদু নামে এক ব্যক্তি তাহার লাঠি দিয়া মৃতদেহে আঘাত করিল। সবসুদ্ধ সাতটি মৃতদেহ আমরা দেখিয়াছিলাম।

এই বন্দীকে আমি পূর্বেই জানিতাম। তাহার পরিধানে

ছিল কুর্তা এবং তেহমল।

বুলনের সাক্ষ্য—

মিউটিনির সময় আমি সম্রাটের একজন আরদালী ছিলাম। ঘটনার দিন সকালে আমি দরজায় ছিলাম। বসন্ত আলি খাঁ খোজাকে জিজ্ঞাসা করি যে কোনও লোক কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছিল কিনা। কাপ্তেন ডগলাসের জমাদার পুরন সিং আসিয়া বসন্ত আলি খাঁকে বলিল যে, ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে এবং মেমসাহেবদের কোনও নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য পালকির প্রয়োজন। খোজা তখন সম্রাটের নিকট গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আসানউল্লা খাঁকে জানাইল যে, এখনই পালকি এবং প্রহরীস্বরূপ খাসবরদার পাঠাইতে হইবে। আমি তখম পালকি সংগ্রহ করিয়া কাপ্তেন ডগলাসের গৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম। দ্বিতলে উপস্থিত হইয়া এই বন্দী হাজী মিয়াকে একখানি রক্তমাখা তরবারি হাতে দেখিলাম। তাহার সঙ্গে মোগল বেগ, খলিকদাদ খাঁ, নব্বু এবং আরও দুজন উপস্থিত ছিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কয়েকটি দেহ (মৃতদেহ বলিয়াই মনে হইল) ইতঃস্তত পড়িয়া আছে। কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া দেওয়াল ধরিয়া আছেন। তাঁহাকে তখনও জীবিত বলিয়া মনে হইল। ঠিক সেই সময় নব্বু তাঁহাকে তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করিল, সঙ্গে

সঙ্গেই তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। আমি ছুটিয়া নিচে আসিয়া পালকির কাহারদের বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই বন্দীকে আমি ভালরূপেই জানি। সেই সময় আমি তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করি নাই, সেও আমার সঙ্গে কোন কথা বলে নাই। তার পর তাহাকে আর দেখি নাই। এই ঘটনার পরে আমি জরির বুনন-কাজ কিছুদিন করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমি মিশন স্কুলের চাপরাসীর কার্য করি।

এই সময়ে বন্দী হাজী মিয়া এই সাক্ষীকে প্রশ্ন করে—কাপ্তেন ডগলাসকে হত্যা করিতে তুমি আমাকে দেখিয়াছ?

উত্তর। না। তিনি সে সময় জীবিত থাকিলেও নব্বুর আঘাতেই তাঁর জীবনের শেষ হয়।

আহম্মদ মির্জার সাক্ষ্য—

মিউটিনির সময় আমি মির্জা আবু বখরের চাকরি করিতাম। ঘটনার দিন সকালে আমি কেল্লার লাহোর গেটের নিকটে যেখানে ফ্রেজার সাহেবের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেখানে এই বন্দীকে রক্তাক্ত তরবারি হস্তে দেখিতে পাই। সেখানে নব্বু, মোগল বেগ, হায়দার, খালিকদাদ এবং দুজন সোয়ারকে দেখিতে পাই। সকলের হাতেই খোলা তরবারি ছিল। ইহারা সিঁড়ি দিয়া

যখন নামিয়া আসিতেছিল, তখন সমবেত জনতা চীৎকার করিতে-ছিল, দীন, দীন, হো গিয়া। আমি প্রায় ১০০ গজ দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বন্দী হাজী মিয়া তখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করিল, আমাকে খুন করিতে তুমি দেখিয়াছ?

সাক্ষী উত্তর দেয়—না।

আমাকে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে দেখিয়াছ?

হাঁ।

আব্বাস মির্জার সাক্ষ্য—

সম্রাটের কালো পল্টনের আমি একজন সিপাহী। মিউটিনির সময় আমি মাসে দুই টাকা এগারো আনা বেতন পাইতাম। মহবুব আলি খাঁর খোজা আমাদের দুইখানি পালকি লইয়া যাইতে আদেশ করে। তাহাতে মেমসাহেবদের লইয়া আসিবার কথা ছিল। আমাদের মধ্যে বুলন হরকরা প্রথমে সিঁড়ির উপর উঠিয়াই ফ্রেজার সাহেবের মৃতদেহ দেখিতে পায়। সেই সময় এই বন্দী হাজী একখানি রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া নামিয়া আসে। খালিকদাদ, মোগল বেগ, নব্বু এবং আরও দুইজন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে। সকলের হাতেই তরবারি ছিল। এই বন্দী মহবুব আলি খাঁর একজন আরদালী। উহার পরিধানে ছিল আংরাখা ও পায়জামা। আমি উপরে ডগলাস সাহেবের ঘরে যাই নাই। বুলন নিচে নামিয়াই বলিল,

ফয়সালা হো গয়া। আমরা তখন পালকি লইয়া ফিরিয়া আসি।

গোরধনের সাক্ষ্য—

আমি সেরাউগী মন্দিরের পুরোহিত। মিউটিনির সময়েও সেই কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ঘটনার দিন আমি প্রাসাদদুর্গে যাই নাই। এই বন্দী হাজী মিয়াকে আমি চিনি। দিল্লী শহর আবার দখল হইলে, জাঠমল নামে এক ব্যক্তি (বর্তমানে মৃত) আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে সীলমোহর খোদাইকর হাজীকে আমি চিনি কিনা। আমি সম্মতি জানাইলে সে আমাকে বলে যে এক ব্যক্তির নিকট সে আমাকে লইয়া যাইবে, তাহাকে সনাক্ত করিয়া আমাকে বলিতে হইবে যে প্রকৃতই হাজী কিনা। পরের দিন জাঠমল আরও দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিল। তাহাদের পরিচয়ে জানাইল যে উহাদের নাম মাখন এবং বখতাওর। তাহারা দুজনেই কাপ্তেন ডগলাসের চাপরাসী ছিল। দিল্লীর নিকটে কদমশরীফে আমরা সকলে গেলাম। সেখানে খোদাবক্স নামে আর এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইল। সেখান হইতে আমরা গেলাম নিজামুদ্দীনে। সেখানে এক জায়গায় আমাকে এবং খোদাবক্সকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জাঠমল জানাইল যে, আমরা হাজীর সন্ধানে আসিয়াছি এবং তাহাকে দেখিতে পাইলেই আমরা যেন তাহাকে সে সংবাদ জানাই। মাখন এবং বখতাওরকে লইয়া সে আরব

সরাইয়ের দিকে গেল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। প্রায় দু ঘড়ি পরে একটা বেনিয়ার দোকানে হাজী আসিয়া কিছু ঘি এবং লবন কিনিল। খোদাবক্স তাহার নিকট যাইয়া বলিল, আমার সঙ্গে একবার আরব সরাইতে এস, বিশেষ প্রয়োজন। হাজী বলিল, ঘি এবং লবন আগে বাড়িতে রাখিয়া আসি, তার পর যাইব। কিন্তু খোদাবক্স পীড়াপীড়ি করায় সে তাহার সঙ্গে চলিল। সেখানে পৌছিয়া আমি জাঠমলকে বলিলাম, এই তো তোমার লোককে পাওয়া গিয়াছে, এইবার আমাকে ছুটি দাও। কিন্তু জাঠমল বলিল, সাহেব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সে তখন মাখন এবং বখতাওরকে পাঠাইল মেটকাফ সাহেবকে ডাকিয়া আনিতে। সাহেব কোথায় ছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু ক্রমে দেরি হইতে লাগিল, আমি তখন জাঠমলকে বলিলাম যে সারা রাত্রি আমি সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। অবশেষে জাঠমল একজন চৌকিদার ডাকিয়া হাজীকে বাঁধিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল, আমি ও খোদাবক্স সেই সঙ্গে চলিলাম। বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইল না। পথেই দেখিলাম—মেটকাফ সাহেব (Sir Theophilus Metcalfe) কয়েকজন সোয়ার সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন এবং এই বন্দীকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিল—মীর হাজী। পেশা ?—বেগরি। বেগরি মানে কি ? উত্তর দিল, সীল-মোহর খোদাই করা।

সাহেব তখন তাঁহার তরবারি বাহির করিয়া এই বন্দীর গলায় আঘাত করিলেন। সে মাটিতে পড়িয়া গেল এবং গলার পাশ দিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি ছুটিয়া পালাইতেছিলাম, কিন্তু মেটকাফ সাহেব ঘোড়ায় উঠিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, দিল্লী যাইয়া আমি যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। পরের দিন আমি গেলাম মেটকাফ সাহেবের কুঠিতে। যাহা কিছু ঘটিয়াছিল সমস্ত বিবরণ বারক্রে সাহেব লিখিয়া লইলেন। খোদাবক্স এখানে উপস্থিত আছে। মেটকাফ সাহেব যখন সোয়ারদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাখন ছিল, বখতাওর ছিল না। আমি শুনিয়াছি মাখনের মৃত্যু হইয়াছে।

মেধার সাক্ষ্য—

আমি নিজামুদ্দীনের চৌকিদার। পূর্বে আরব সরাইতে ছিলাম। এই বন্দীকেই একদিন সন্ধ্যার সময় মেটকাফ সাহেব তরবারি দিয়া আঘাত করেন। মিউটিনির পরে বহু লোক দিল্লী শহর হইতে পলায়ন করিয়া নিজামুদ্দীন এবং আরব সরাইতে লুকাইয়া ছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় এই বন্দীকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে ডাকিয়া আনা হয়। পথের মধ্যে মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। সাহেবের তরবারির আঘাতে এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই আমার মনে হয়। আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার মৃতদেহের কি ব্যবস্থা করা

যাইবে। তাহাতে তিনি কোনও উত্তর দেন নাই। আলি বক্স নামে আর একজন চৌকিদারের জিম্মায় উহার দেহ পড়িয়া থাকে। আলি বক্সের মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তির দেহ কিরূপে সরাইয়া লওয়া হইল এবং কিরূপেই বা এ আবার বাঁচিয়া উঠিল তাহা আমি জানি না।

॥ বন্দী হাজী মিয়ার জবানবন্দী ॥

নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া হাজী বিচারসভায় প্রকাশ করে এবং বলে—মিউটিনির সময় আমি প্রাসাদদুর্গে আদৌ ছিলাম না। মিউটিনির অনেক পূর্বে লাহোর গেটের নিকট তিনমাস মাত্র আমার একটি দোকান ছিল। তার পরে শহরের মধ্যে জহুরী বাজারে আমি দোকান উঠাইয়া লইয়া যাই এবং চাঁদনী চকের নিকট কুচা রহমান মহল্লায় বাসা করি। মিউটিনির পরে ইংরাজেরা যখন দিল্লী শহর পুনরায় অধিকার করেন, সে সময় অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে আমি শহর ছাড়িয়া পলায়ন করি এবং নিজামুদ্দীনে যাইয়া বাস করি। সেখানে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মেটকাফ সাহেব সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আমার সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই তাঁহার তরবারি দিয়া আমার গলায় এমন আঘাত করেন যে চার মাস কাল আমি প্রায় অচৈতন্য ছিলাম। আমার যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় তখন আমি রেওয়ারীতে। আমার শ্যালক আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল। তিনি এখন

পরলোকে। তার পর আমি জয়পুরে যাই এবং সেখানে তিন বৎসর থাকি। অতঃপর লাহোরে যাইয়া আমার সীলমোহর খোদাইয়ের ব্যবসা করি। দিল্লীতে যে দিন মিউটিনির ব্যাপার সুরু হয়, সেদিন কুচা রহমান মহল্লার বাড়ি ছাড়িয়া আমি কোথাও যাই নাই। জহুরী বাজারে আমি আমার কাজে যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শহরে গোলমালের খবর পাইয়া আমি বাড়িতেই থাকিলাম। আমার শাশুড়ী কেল্লায় থাকিতেন। আর আমার কিছু বলিবার নাই।

হাজীর পক্ষে সাতজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়। সকলেই স্বীকার করে যে কুচা রহমান মহল্লায় তাহার বাসা ছিল এবং জহুরী বাজারের বালাখানায় তাহার একটি দোকান ছিল। তাহার শাশুড়ী প্রাসাদদুর্গে ধাত্রীর কাজ করিত। ঘটনার দিন সকালে বন্দী কোথায় ছিল তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কেহই বলিতে পারে নাই।

॥ সেসন জজের মন্তব্য ॥

যে দুর্ঘটনার ব্যাপার লইয়া এই বিচারসভা গঠিত তাহাতে যে সব সাক্ষীদের জবানবন্দী ও অন্যান্য প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে সকালে দিল্লী সম্রাটের প্রাসাদে যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে এবং যে সব ইউরোপীয়

ভদ্রমহোদয়গণ এবং ভদ্রমহিলাগণ নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন, সেই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক বলিয়া এই বন্দী অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহার অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পূর্বেকার বিভিন্ন বিচারসভাতেও গৃহীত হইয়াছে। এই সকল অপরাধের অন্যতম অপরাধী মোগল বেগের ফাঁসির হুকুম মঞ্জুর করিবার সময় জুডিসিয়াল কমিশনার সাহেব ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পর এই ঘটনার নৃশংসতা সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তবুও বর্তমান আসামীর বিচারের সময়ও এই মোকর্দমা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে।

এই জঘন্যতম অপরাধ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা অস্বীকৃতির অবকাশ নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে একটিমাত্র বিচার্য প্রশ্ন এই যে অভিযুক্ত হাজী এই হত্যা ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিল কিনা।

দুইজন সাক্ষী বলিয়াছে তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, এই অভিযুক্ত বন্দী মিস্টার ফ্রেজারকে হত্যা করিয়াছে। অপর কয়েকজন বলিয়াছে যে কয়েক ব্যক্তি দ্বিতলে কাপ্তেন ডগলাসের ঘরের দিকে গিয়াছিল এবং সেখানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া দীন দীন শব্দ করিয়া নিচে নামিয়া আসিয়াছিল, এই বন্দীও তাহাদের মধ্যে ছিল।

সাক্ষীরা যদি সত্য কথা বলিয়া থাকে এবং এই বন্দী যদি সেই হত্যাকারীদের দলের মধ্যে কোন সাক্ষী হিসাবেও থাকিয়া

থাকে, তাহা হইলেও সে হত্যাকারীদের অন্যতম এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাপ্তেন ডগলাস যে ঘরে ছিলেন, সে ঘরের সকলকে হত্যা ঠিক কোন্ ব্যক্তি করিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ দর্শক আজ কেহ জীবিত নাই। সাক্ষীরা যে সকলেই সত্য কথা বলিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই বন্দী যে হত্যাকারীদের একজন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। এ মোকদ্দমায় কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে কিংবা এই বন্দীকে সনাক্ত করিতে ভুল করিয়াছে এরূপ সন্দেহের কোনও কারণ নাই। যে সকল সাক্ষী আজ জীবিত নাই, তাহারাও অভিযুক্ত হাজী সম্বন্ধে পূর্বেকার বিচারসভায় অনেক কথা বলিয়াছে। সীলমোহর খোদাইকর হাজী সাইমন ফ্রেজারের প্রধান হত্যাকারী নয় একথা কোনও সাক্ষীই বলে নাই। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে যখন সম্রাটের বিচার হয়, ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন মোগল বেগের ফাঁসির আদেশ হয় এবং নব্বু মহম্মদ শেখ ইহাদের বিচারের সময়েও সাক্ষীরা এই বন্দী হাজী সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়াছে, বর্তমানে আমাদের সাক্ষীগণের উক্তির সঙ্গে তাহার কোনও অনৈক্য নাই।

সাক্ষীগণের সঙ্গে এই বন্দীর ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে তাহাও কল্পনা করিবার কোনও কারণ নাই। তাহাকে চিনিতেও কাহারও ভুল হয় নাই। প্রাসাদদুর্গে সে প্রায়ই যাইত, তাহার শাশুড়ী প্রাসাদের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সে নিজেও কেল্লার

প্রবেশপথের নিকট একটা দোকানে কাজ করিত। সেই দোকানঘরের উপরেই কাপ্তেন ডগলাস থাকিতেন তাঁহার চাপরাসীরা সর্বদাই নিচে আসা-যাওয়া করিত এবং এই বন্দীকে উত্তমরূপে চিনিত।

তাহাকে যে ভুলক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ইহাও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। দিল্লী পুনরুদ্ধারের পরে বহু মুসলমান অধিবাসী দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া প্রায় চার মাইল দূরে নিজামুদ্দীনে আশ্রয় লয়। এই বন্দীও সেই সময় দিল্লী ত্যাগ করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং গ্রেপ্তারের পরে দিল্লীতে আনীত হইবার পথে স্যার টি, মেটকাফ ইহাকে দেখিতে পান এবং তিনি নিজের হাতে তরবারি দিয়া ইহার গলায় আঘাত করেন। তার পর ইহাকে মৃত মনে করিয়া তিনি চলিয়া যান। এই বন্দীও স্বীকার করিয়াছে যে মেটকাফ সাহেব তাহাকে তরবারির আঘাতে ভূপাতিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বন্দীই যে সেই ব্যক্তি তাঁহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

বন্দী নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সে স্বীকার করিয়াছে যে তাহার শাশুড়ী প্রাসাদের মধ্যে বাস করিতেন এবং সে নিজেও কিছুদিন সেখানে ছিল, কিন্তু মিউটিনির যোগাযোগের পূর্ব হইতেই সে চাঁদনি চকের নিকট কুচা রহমান মহল্লায় বাস করিতেছিল। ঘটনার দিন সে প্রাসাদে আদৌ যায় নাই, নিজের বাড়িতেই ছিল। তাহার সাক্ষীদের

বক্তব্যগুলি আলোচনা করিলে এ বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্যার টি মেটকাফ সাহেব তাহাকে আহত করিবার দীর্ঘকাল পরে লাহোরে তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে বন্দী বলিয়াছে যে চার মাস কাল সে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিল, তখন তাহার শ্যালক তাহাকে রেওয়ারীতে লইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে সে জয়পুরে যাইয়া তিন-বৎসর ছিল, তার পর সে লাহোরে যায়। দিল্লীতে সে যে আর ফেরে নাই ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এই বিচারের এসেসরগণ (assessors) এই বিচারের সিদ্ধান্তে ঠিক একমত হইতে পারেন নাই। একজন এই বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। অপর দুই জন স্বীকার করিয়াছেন যে ঘটনার সময় সে রাজপ্রাসাদে জনতার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল বটে, কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা ঠিক প্রমাণিত হয় নাই। সাক্ষীদের বর্ণনা বিশ্বাস করা বা না করা তাঁহাদের ইচ্ছা। সুতরাং এই আদালত নিজের কোন মত প্রকাশ না করিলে দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশর মতে এই বন্দী মুক্তি পাইবার অধিকারী।

কিন্তু এই আদালতের অভিমত ভিন্ন প্রকার। অধিকাংশ এসেসরের মতের পোষকতা না করিয়া এই আদালত মনে করেন যে, এই বন্দী হাজীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণভাবে দোষী। Regulation VIII of 1799 অনুসারে সে

মৃত্যুদণ্ড পাইবার যোগ্য।

এই আদালত সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, অপরাধী হাজীকে ফাঁসির দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক। ইতিপূর্বে মোগল বেগের ফাঁসির সময় যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ইহার সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হউক। অর্থাৎ মিলিটারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া দিল্লীর প্রাসাদদুর্গের সম্মুখে—যেখানে এই সকল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, সেইখানেই ইহার চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করা হউক।

বিচারের এই সব নথিপত্র চীফ কোর্টের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইল।

॥ চীফ কোর্টের মন্তব্য ॥

১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৮

দিল্লীতে কর্নেল ডব্লু ম্যাকনীল (Col. W. McNeile) সেসন জজের অধিনায়কত্বে তিন জন এসেসর লইয়া ১০ই ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখে যে সেসন আদালত বসিয়াছে তাহাতে হাজী মিয়া (পিতার নাম মুসীতা) ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে মিস্টার ফ্রেজার এবং আরও কয়েকজন ইউরোপীয় নরনারীকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। অধিকাংশ এসেসরের মতের প্রতিকূলে আদালত তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন।

সেই আদেশ এই চীফ কোর্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

সেজন্য সেসন আদালতের নথিপত্র এখানে পাঠানো হইয়াছে।

মোগল বেগের বিচারের প্রসঙ্গে জুডিসিয়াল কমিশনার ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, মিস্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকে ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে দিল্লীতে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

বর্তমান বিচার প্রসঙ্গেও সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অভিযুক্ত হাজী, সীলমোহর খোদাইকর—ইহার নাম হত্যা-কাণ্ডের বিবরণীর প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে। সেই নির্মম কাণ্ডের এই ব্যক্তি যে অন্যতম নেতা সে কথাও বলা হইয়াছে। দিল্লীর পতনের পরেই এই ব্যক্তি নিরুদ্দিষ্ট হয়। তার পর দিল্লীর নিকটবর্তী এক স্থানে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। স্যার টি, মেটকাফের আদেশে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি নিজের তরবারি দ্বারা ইহাকে আঘাত করেন এবং মৃত মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন।

অভিযুক্ত হাজী অতঃপর কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকে। তার পর দিল্লী পুলিশের নিকট সংবাদ আসে যে সে জীবিত আছে এবং লাহোরে বসবাস করিতেছে। তার পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

॥ বিচারের সিদ্ধান্ত ॥

এই আদালতে সেসন জজের অভিমত সমর্থন করিয় জানাইতেছেন, সাক্ষীগণের বর্ণনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অভিমতের উপর আমাদের কোনও মন্তব্য নাই।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে অভিযুক্ত বন্দী যে গুরুতর অপরা করিয়াছে, তাহার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। স্যার টি, মেটকা: তাহাকে একবার তরবারির আঘাত করিয়াছিলেন এবং সে আঘাতে সে মৃতবৎ পড়িয়া ছিল, কেবল এই জন্যই চিন্তা কর যাইতে পারে যে, কোনও লঘু শাস্তি তাহাকে দেওয়া উচি কি না। কিন্তু বন্দী যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়কত্ব করিয়াছে, (কথা মনে করিলে তাহাকে দয়া করা বা তাহার দণ্ড হ্রাস করা প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সুতরাং চরম দণ্ড সম্বন্ধে তাহার প্রা যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে কোনরূপে লঘু ক সম্বন্ধে আমরা সম্মতি দিতে অপারগ।

সুতরাং সেসন জজ কর্তৃক মুসীতার পুত্র হাজীর প্রতি (মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই আদালত তাহা সম: করিতেছে।

॥ সমাপ্ত ॥